দুর্দান্তের দস্যিপনা

শ্রীঅখিল নিয়োগী

রূপায়িত করেছেন, চিত্রশিল্পী—

শ্রীমনোজ বসু

পরিচালনা—

শ্রীশরৎচন্দ্র পাল

(কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির প্রতিষ্ঠাতা)

পরম স্নেহভাজন

শ্রীমান অশোক দত্ত

করকমলেষু

নববর্ষ
১লা বৈশাখ, ১৩৫৫
'সব-পেয়েছির-আসর'

প্রীতিকামী
শ্রীঅখিল নিয়োগী
(স্বপন-বুড়ো)
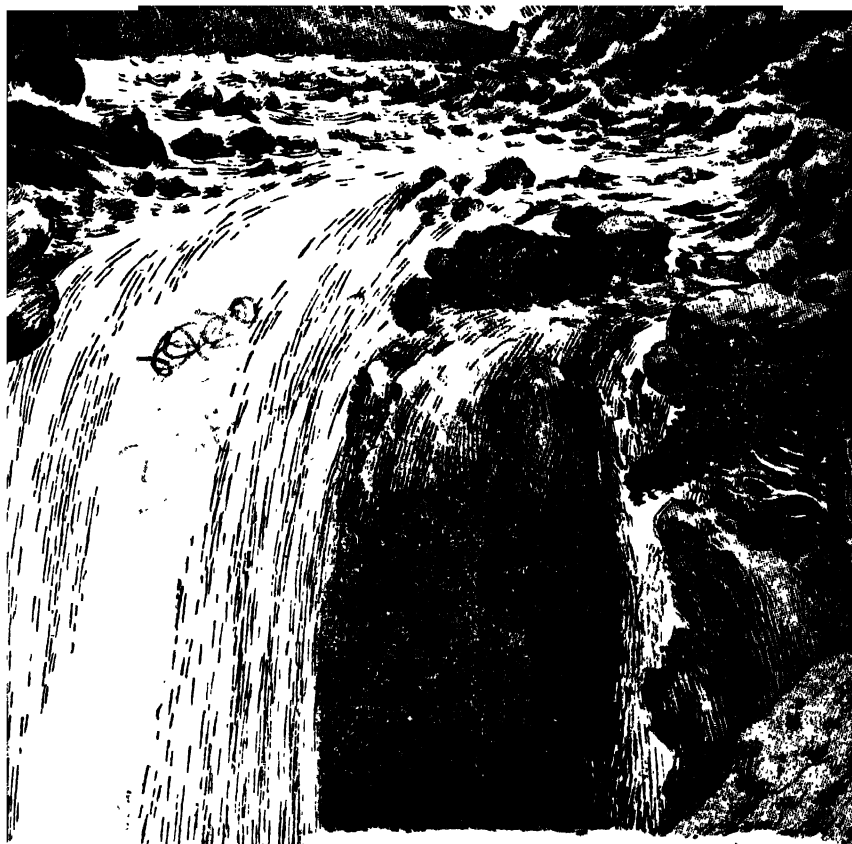
দুর্দ্দান্তের দস্যিপনা

নামটা শু'নেই তোমরা ভাবছো, রঘুডাকাত কিম্বা রবীনহুডের মতো এক দস্যুর রোমাঞ্চকর কাহিনী তোমাদের শোনাতে বসেছি। কিন্তু তা মোটেই নয়। দুর্দ্দান্ত হ'চ্ছে শ্রীমন্তের কুকুরের নাম।

দুর্দ্দান্ত

শ্রীমন্ত কে, জিজ্ঞেস করছো ? শ্রীমন্ত হ'চ্ছে তোমাদের মতোই এক কিশোর বালক। বাঙলাদেশের এক অজ-পাড়াগাঁয়ে থাকে আর সেখানকার ইস্কুলেই পড়ে।

অজ-পাড়াগাঁ শুনে তোমরা অমন নাকের ডগাটা কুঁচ্‌কে থেকোনা। কেননা, শ্রীমন্তদের বাড়ী ছোট হ'লে কি হবে ? ছবির মতন ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে সে বাড়ী···খানিকক্ষণ তাকিয়ে দেখবার মতো। সেই বাড়ীতে কে-কে থাকে জানো ?

শ্রীমন্তের বাবা, মা, তার ছোট বোন, হসন্ত··· আর আছে ওদের বাঘা-কুকুর, তারি নাম—দুর্দ্দান্ত।

এখন তোমাদের কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়েছে নিশ্চয়ই।

তোমরা হয়তো এরি মধ্যে ভাবতে সুরু করেছো যে, আজকালকার দিনে সহরের কথা, সিনেমার কথা, খেলার কথা, বিজ্ঞানের কথা—এসব না ব'লে সামান্য একটা কুকুরের গল্প আমি সুরু করলাম কেন ?

কিন্তু গল্পটি যখন শেষ হবে—তোমরাই বলতে পারবে কেন আমি এই দুর্দ্দান্তের কাহিনী তোমাদের শোনাতে বসেছিলাম।

দুর্দ্দান্ত এ-বাড়ীতে কি ক'রে এলো সেই কাহিনীই বলছি। শ্রীমন্তের বাবা নানা কাজে ব্যস্ত থাকেন, সেইজন্যে তাঁকে সবসময় বাইরে ছুটোছুটি করতে হয়। পাড়াগাঁ—রাত-বিরেতে চোর-ছেঁচড়ের ভয় আছে···একটা আপদ-বিপদ হ'তে কতক্ষণ ?

দস্যিপণা

তাই একবার বাইরে থেকে ফেরবার মুখে তিনি সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলেন মোটাসোটা একটি কুকুর।

কুকুরটাকে দেখলেই অন্তরাত্মা শুকিয়ে কাঠ হয়ে ওঠে। মনে হয়, এক্ষুনি বুঝি লাফিয়ে এসে টুঁটি কামড়ে ধরবে।

শ্রীমন্ত আর হসন্ত যেমন আনন্দের সঙ্গে লাফিয়ে এসেছিল, ঠিক ততটা জোরেই থম্‌কে গিয়ে ঘামতে সুরু করলে।

ওর বাবা ডেকে বললেন, ভয় নেই রে! আয় ওর সঙ্গে তোদের পরিচয় করিয়ে দিই।

ভাই-বোন অতি সঙ্কোচের সঙ্গে এক-পা দু-পা ক'রে বাপের গা-ঘেঁষে দাঁড়ালো।

বাবা বললেন, ওর গায়ে হাত দিয়ে ছাখ্! কিচ্ছুটি বলবেনা।

শ্রীমন্ত শিউরে উঠলো···ওরে বাস্‌রে! এই বিশাল বাঘের মতো কুকুরটার গায়ে হাত দেওয়া? ও সইবে কেন? একেবারে মুচ্‌মুচে বিস্কুটের মতো যদি চিবিয়ে খায় তবু আপত্তি করবার কিছু থাকবেনা।

শ্রীমন্তের মনের ভাব বোধহয় বাবা বুঝতে পারলেন, তাই ওকে কোলে নিয়ে নিজেই ওর কচি হাতটা কুকুরটার পিঠের উপর দিয়ে বুলিয়ে নিলেন।

কী তুল্‌তুলে নরম! একেবারে মখমলের তৈরী বললেও চলে। শ্রীমন্ত পূজোর সময় যে রকম পোষাক পেয়েছিল ঠিক তারই মতো তুল্‌তুলে আর কোমল!

দুর্দান্তের

বাবা হো-হো ক'রে হেসে উঠে বললেন, ঠিক যতটা ভয় পাচ্ছিস সে রকম কিছু নয় রে! বাড়ীর লোককে ও কিচ্ছু বলবেনা।

হসন্ত ততক্ষণ পিট্‌পিট্ ক'রে ব্যাপারটা শুধু দেখছিল। —কি সাহস দাদাটার! অত বড় জানোয়ারটার পিঠে হাত বুলিয়ে দিলে! ও ত' রাগও করতে পারতো! হসন্ত অনেক বুদ্ধি ক'রে ভাবছিল, আমরা যদি পণ্ডিত-মশায়ের পিঠে অমনি ক'রে হাত বুলিয়ে দি, তিনি চট্‌বেন না? হয়তো একটা বেত আমাদের পিঠেই বসিয়ে দেবেন।

বাবা ওর মনের দুঃখুটা হয়তো বুঝতে পারলেন, তাই ওকেও কোলে নিয়ে ওর অতৃপ্ত মনের সাধটা পুরোপুরি-ভাবেই পূরণ ক'রে দিলেন।

এইবার একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাবা বললেন, আলাপ-পরিচয় ত' তোমাদের সঙ্গে হ'ল। এইবার ওর একটা নাম রাখতে হবে...কি ব'লে তোমরা ডাকবে ওকে?

শ্রীমন্ত লাফিয়ে উঠে বললে—T I G E R.

ওর বলবার ধরন দেখে বাবা না হেসে থাকতে পারলেননা। বললেন, কেন, Tiger কেন? আমরা ত' সাহেব নই, আর বাঙলা নামও আমাদের ফুরিয়ে যায়নি। একটা বাঙলা নামই নাহয় রাখোনা তোমরা!

হসন্ত চোখ পিট্‌পিট্ ক'রে জবাব দিলে, বাঘা, বাবা—বাঘা।

ওদের বাবা মুচ্‌কি-মুচ্‌কি হাসতে লাগলেন। বললেন, বাঘা

দস্যিপণা

নাম অবশ্য খারাপ নয়, কিন্তু বড্ডো পুরোনো হয়ে গেছে। যে-কোনো বাড়ীতে যাও যেখানে কুকুর পোষা হয়, দেখবে, অনেকেই তাদের কুকুরকে বাঘা ব'লে ডাকে। নতুন নাম কিছু বলো শুনি।

ভাই-বোন দু'জনেই চুপ্‌চাপ্‌!

আকাশ-পাতাল ওরা ভাবতে থাকে।

হসন্ত হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বললে, ধাঁধার জবাবে অনেক নতুন নাম পাওয়া যায়, সেইটে নিয়ে আসবো বাবা?

বাবা বললেন, না, না, ধাঁধার জবাব আনতে হবেনা। আর সে-সব ত' মানুষের নাম। কোনো মানুষের নামে কুকুরকে ডাকলে আসল যার নাম সে শুনতে পেলে খুব খুশী হয়ে উঠবেনা। নাম আমি ঠিক ক'রে ফেলেছি: ওর নাম রাখবে তোমরা—দু-র্দ্দা-ন্ত।

—ওরে বাবা! দুর্দ্দান্ত? হসন্ত চোখ দুটো বড়-বড় ক'রে কথাটা শোনে। কথা গিলে নেয় বলেই মনে হয়। আগে বানানটাও চুপিচুপি ঠিক ক'রে ফেলে। কি জানি যদি কোনো রকম ভুল হয়ে যায়। সোজা নাম ত' নয়, একেবারে—দুর্দ্দান্ত।

শ্রীমন্ত কিন্তু ততক্ষণে ছুটে বাইরে পালিয়ে যায়। বন্ধু-বান্ধবদের কাছে ওদের নতুন কুকুরের গল্প আর সেইসঙ্গে নামটার কথা জাহির ক'রে একটা আসর জমাতে হবে ত'!

লজেন্স যেমন চুষে-চুষে খায়, ও ঠিক তেমনি 'দুর্দ্দান্ত' নামটা আপন মনে আবৃত্তি করতে থাকে।

দুর্দ্দান্তের

— ২ —
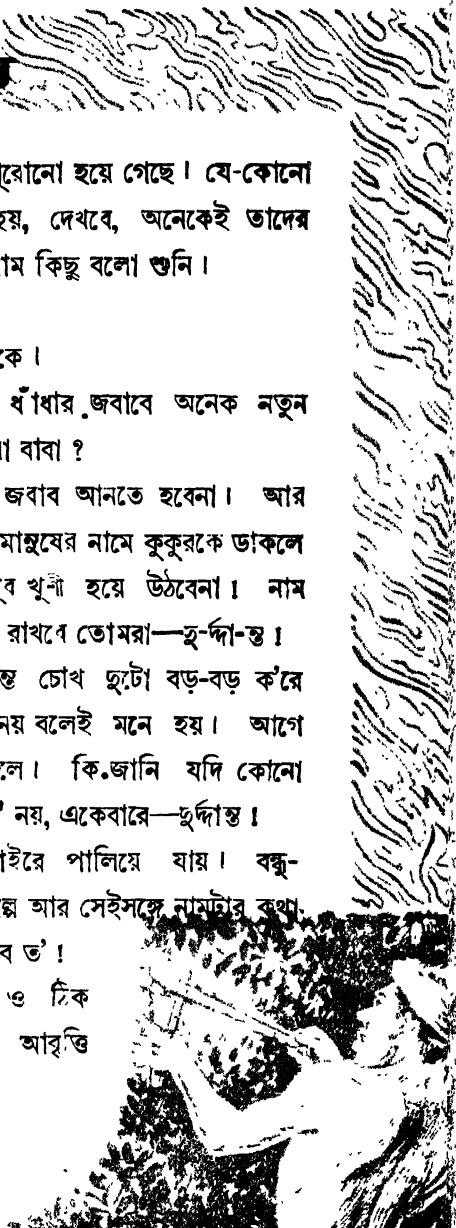
তারপর থেকে দুর্দ্দান্ত ওর বাহন ব'লে ছেলে-মহলে শ্রীমন্তের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি খুব বেড়ে গেল। শুধু তাই নয়, দুর্দ্দান্ত হয়ে উঠলো শ্রীমন্তের একেবারে সাথের সাথী।

শ্রীমন্ত সকালবেলা উঠে একটু ব্যায়াম করে, বল ছোঁড়া-ছুঁড়ি খেলে, সেখানে দুর্দ্দান্ত তার সঙ্গে রীতিমত খেলোয়াড়। শ্রীমন্ত পড়াশুনো করে, জোরে-জোরে নামতা পড়ে, ইংরেজী-কবিতা মুখস্ত করে, দুর্দ্দান্ত অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, হয়তো ভাবে—আদরের কথা নানাভাবে ঐরকম ক'রে তাকেই বলছে। তাই মাঝে-মাঝে সে পুলকিত হয়ে ল্যাজ নাড়তে সুরু করে। শ্রীমন্ত স্নান খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে ইস্কুলে রওনা হয় আর দুর্দ্দান্ত তার বইয়ের থলে কাম্‌ড়ে ধ'রে পিছু-পিছু চলে। কখনো-বা ছুটে আগে গিয়ে গাছের আড়ালে লুকোচুরি খেলা সুরু করে। শ্রীমন্ত যদি ধমক দিয়ে বলে, ইস্কুলে যাবার দেরী হয়ে যাচ্ছে, অমনি সে শান্ত-শিষ্ট সুবোধ হয়ে গিয়ে গুটি-গুটি তার পিছু নেয়।

দুর্দ্দান্তের একটা মহা দুঃখু যে, ইস্কুলে ও কিছুতেই ঢুকতে পারেনা। ইস্কুলের দারোয়ানটার সঙ্গে ওর আদপেই বনেনা,

দস্যিপণা

ওকে দেখলেই গোঁফ পাকিয়ে দারোয়ানটা এমনভাবে তাকায় আর লাঠির জন্যে এদিক-ওদিক খোঁজে যে, দুর্দ্দান্তের সঙ্গে কোনোমতেই তার ভাব হ'তে পারেনা।

আরো একটা মুস্কিল এই যে, ইস্কুলে জন্তু-জানোয়ারের ঢোকবার কোনো হুকুম নেই। ও যদি মানুষ হ'ত ত' শ্রীমন্তের সঙ্গে গিয়ে নিশ্চয়ই বেঞ্চে বসতো আর মাথা নেড়ে-নেড়ে ঐরকম পড়া শিখতো। জানলা দিয়ে ও সব দেখেছে কিনা!

সাতটা দিন ওর এক রকম ঘর-বার আর ওঠ-বোস ক'রে কেটে যায়। কিন্তু যেই ঢং ঢং ক'রে দেয়াল-ঘড়িতে চারটে বাজে, আর ওকে আটকে রাখে কার সাধ্যি! ল্যাজ তুলে দুর্দ্দান্ত ছুটে চ'লে যায় একেবারে ইস্কুলের সামনের বটগাছটার তলায়। শ্রীমন্তও ছুটতে ছুটতে বই খাতাপত্র নিয়ে বেরিয়ে আসে ইস্কুল থেকে। দুর্দ্দান্ত ওকে দেখে ঘন-ঘন ল্যাজ নাড়ে আর মাথা দোলাতে থাকে, যেন কত জন্ম ও শ্রীমন্তকে দেখেনি!

এইসব ব্যাপার দেখে হসন্ত নাকের ডগাটা কুঁচ্‌কে বললে, হুঁ! দুর্দ্দান্তের সবতাতেই বাড়াবাড়ি! এমন ভাব দেখায় যে, দাদাকে যেন ও আমাদের চাইতে কত বেশী ভালোবাসে!

মুখে বলে বটে, কিন্তু মনে-মনে বোঝে শ্রীমন্তের ভালোবাসা আর টান ওর ওপর থেকে আস্তে-আস্তে দুর্দ্দান্তের ওপর পড়ছে। এজন্যে এক-এক সময় হসন্তের ভারী হিংসে হয়।

দুর্দান্তের

একদিন মার গলা জড়িয়ে ধ'রে হসন্ত বললে, হ্যাঁ মা, ওই বিচ্ছিরি বদ্‌খত্‌ জানোয়ারটার জন্যে কেন মাসে-মাসে মাংস আর দুধেতে খরচ করছো? আমার পুতুল কিনে দেবার বেলাতেই তোমাদের যত আপত্তি। দাও ওকে :কারো কাছে বিলিয়ে।

তাছাড়া···গায়ে যে বোট্‌কা গন্ধ!

মেয়ের মনে যে ব্যথা কোথায় মা তা বেশ বুঝতে পারেন। তবু মুখ টিপে হেসে জবাব দেন, বোট্‌কা গন্ধ আবার কোথায় রে? ও, বুঝতে পেরেছি! দুর্দান্তটা শ্রীমন্তের খাটে শোয় ব'লে তোর বুঝি রাগ হয়েছে? আচ্ছা, আজ আমি বলবখন যাতে ও তোর কাছে থাকে।

ঠোঁট উল্টে হসন্ত বললে, বয়ে গেছে ওই জানোয়ারটাকে আমার খাটে উঠতে দিতে! সারা রাজ্যি ঘুরে আসে,—পা ধোয়না, মুখ ধোয়না······একেবারে খাটের ওপর। ছিষ্টি একাকার ক'রে ফেললে!

একরত্তি হসন্ত ঠাকুমা-দিদিমাদের ধরনে একটা ভঙ্গী করে!

মা জবাব দিলেন, তুই আর-একটু বড় হ, তারপর ইস্কুলে যেতে সুরু করলে দুর্দান্ত তোর বইয়ের থলেও কেমন নিয়ে যাবে দেখবি। সব মেয়েরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবে।

হসন্ত ফোঁস ক'রে উঠে বললে, কেন, আমার হাত কি 'নুলো' হয়ে গেছে যে, কুকুরকে দিয়ে বই বওয়াতে হবে। বই হ'চ্ছে বিদ্যে, মা সরস্বতী······তাকে এমন অশ্রদ্ধা করলে চলে?

এই ব'লে পুরুতঠাকুরের মতো সে নিজের একটা বই হাতে তুলে নিয়ে ভক্তি-ভরে প্রণাম করে। আড়চোখে মার দিকে তাকিয়ে ফোঁড়ন কাটে, বিদ্যে দাদার যা হবে, সে বুঝতেই পারা যাচ্ছে। সারাদিন খালি কুকুর আর কুকুর। দাদার বইয়েতেই আছে, "যার যেমন সঙ্গী-সাথী সে সেইরকম লোক!" তুমিই বলোনা মা!

মা এইবার আর হাসি চাপতে পারলেননা কিছুতেই। বললেন, আর, তোর সঙ্গী-সাথী কে, শুনি?

হসন্ত একটু ভ্রূ-কুঁচকে ভেবে নিয়ে জবাব দিলে, আমার সঙ্গী-সাথী—তুমি জানোনা মা? তারা হ'চ্ছে—বই। তোমার দস্যি ছেলেটার মতো নোংরা কুকুর নয়। তারপর একটু ভারী-গলায় বললে, জানি আমি, তুমি আমায় দু'চক্ষে দেখতে পারোনা!

মা মেয়েটাকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন, ভারী পাকা-পাকা কথা হয়েছে তোর, না রে?

ঠিক এমনি সময় শ্রীমন্ত দুর্দ্দান্তকে সঙ্গে ক'রে লাফাতে-লাফাতে এসে হাজির।

হসন্ত লাফিয়ে উঠে মায়ের গলা জড়িয়ে ধ'রে বললে, এই দেখো মা, আমি তোমায় যা বলেছিলাম—ঠিক তাই নয়?

শ্রীমন্ত ফোঁড়ন দিয়ে জবাব দিলে, ও! দুর্দ্দান্ত তোর কাছে একটুও যায়না ব'লে বুঝি মার কাছে ব'সে-ব'সে খুব লাগাচ্ছিস? জানিস ত' ওর নাম হ'চ্ছে দুর্দ্দান্ত। প্যান্‌পেনে কান্না আর ঘ্যান্‌ঘেনে কথা ও একেবারে

দুর্দ্দান্তের

সইতে পারেনা। দুর্দ্দান্ত ত' একেবারে দুর্দ্দান্ত। সেই জন্যেই ত' আমার সঙ্গে ওর এত ভাব।

হসন্ত বললে, শুনেছো মা, শুনেছো? আমি প্যান্‌প্যান্ ক'রে কাঁদি? না, ঘ্যান্‌ঘ্যান্ ক'রে কথা বলি? না-না, তুমি মা অমন মুখ টিপে-টিপে হাসতে পারবেনা, তাতে দাদার আস্পর্দ্ধা আরো বেড়ে যাবে।

মা বললেন, আচ্ছা, আজ আমি তোদের দু'জনের ঝগড়া মিটিয়ে দিচ্ছি। দুর্দ্দান্ত ত' আর শ্রীমন্তের একার নয়, হসন্তেরও।

বাবা বাড়ীতে ঢুকতে-ঢুকতে বললেন, হ্যাঁ, দুর্দ্দান্ত হ'চ্ছে—শ্রীমন্ত আর হসন্ত দু'জনেরই বাহন। যেমন লক্ষ্মী সরস্বতীর বাহন—প্যাঁচা আর রাজহাঁস আর কার্ত্তিক গণেশের বাহন—ময়ূর আর ইঁদুর। দেবতাদের জনে-জনের বাহন থাকতে পারে, কিন্তু মানুষের ত' আর তা হওয়া সম্ভব নয়, তাই শ্রীমন্ত আর হসন্তের বাহন হ'চ্ছে—দুর্দ্দান্ত। তা ও একাই একশো। কি বলিস মা হসন্ত?

বাপের আদরে হসন্ত এইবার একগাল হেসে ফেললে। তারপর আড়ালে গিয়ে দাদাকে বললে, এইবার কেমন জব্দ?

ভাগাভাগিটা কিন্তু মুখে-মুখেই হয়ে রইলো। আসলে দুর্দ্দান্ত শ্রীমন্তের অঙ্গুলি-হেলনে ওঠে আর বসে। হসন্তের মতো পুঁচকে মেয়ে সেখানে পাত্তা পাবে কি ক'রে?

৩—

সেদিন স্কুলে যাবার সময় বড়-বড় চিংড়িমাছের মাথা ভাজা হয়েছে। এ'রি মধ্যে আবার হসন্তও ইস্কুলে ভর্ত্তী হয়ে গেছে। কেননা, দুর্দ্দান্ত দাদার বই-পত্তরের থলে বয়ে নিয়ে যায়, তারই-বা যাবেনা কেন? সেইজন্যেই তাকে তাড়াতাড়ি পাঠশালায় ভর্ত্তী হ'তে হ'ল। ওদিকে শ্রীমন্তের খাওয়া হয়ে গেছে। হসন্ত আবার অত তাড়াতাড়ি খেতে পারেনা। ভাবলে, চিংড়িমাছের মাথাটা একেবারে মাঠে মারা যাবে? তাই ঠাকুরকে বললে, ওটা তুমি আলাদা ক'রে তুলে রেখে দাও, আমি পাঠশালা থেকে ফিরে ভালো ক'রে চিবিয়ে-চিবিয়ে খাবো।

ঠাকুর জবাব দিলে, আচ্ছা দিদিমণি, তাই হবে।

হসন্ত নাচতে-নাচতে উঠে চ'লে গেল। নইলে দাদাটা যে দুষ্টু, হয়তো দুর্দ্দান্তকে নিয়ে আগেই পালিয়ে যাবে।

সেদিন পাঠশালায় হসন্তের যা পড়াশুনো হ'ল তা তোমরা বুঝতেই পাচ্ছো। মনে মনে খালি এই চিন্তা যে, কখন পাঠশালা ছুটি হবে আর কখন সে গিয়ে চিংড়িমাছের মুড়োতে কামড় বসাবে।

ঠিক চারটের সময় শ্রীমন্ত বেরিয়ে দেখে, হসন্ত একেবারে সামনের গাছতলায় হাজির।

শ্রীমন্ত বললে, চল্‌না হসন্ত, খানিকটা

নদীর ধার দিয়ে বেড়িয়ে যাই। এত শীগ্‌গির বাড়ী ফিরে কি হবে? দুর্দ্দান্তও মহা পুলকিত হয়ে ল্যাজ নেড়ে তার সম্মতি জানাতে লাগলো।

কিন্তু হসন্ত আপত্তি ক'রে বললে, কী যে তোমার সখ দাদা,

এই রদ্দুরে কেউ নদীর ধারে বেড়াতে যায়? যাবো নাহয় সেই সন্ধ্যেবেলা। আমার এখন যা ক্ষিদে পেয়েছে। কাজেই বই-পত্তর নিয়ে সবাইকে একসঙ্গে বাড়ী-মুখো রওনা হ'তে হ'ল।

বাড়ীতে পা দিয়েই হসন্ত এক-ছুটে একেবারে রান্নাঘরে হাজির।

কিন্তু এ কি! ঢাক্‌নাটা ওল্টানো, তার এত সাধের চিংড়িমাছের মাথাটা একেবারে উধাও!

হসন্তের চোখ ফেটে জল এসে পড়লো।

চোখের জল মুছে মেঝের দিকে তাকিয়ে দেখে, ঘর-নিকোনো কাদার ওপর দুর্দ্দান্তের পায়ের ছাপ। তখন আর ওর কিছুমাত্র সন্দেহ রইলোনা। ছুটতে-ছুটতে গিয়ে মার গলা জড়িয়ে ধ'রে বললে, দেখে যাও মা, দাদার দুর্দ্দান্তের কাণ্ড! রাগ হলেই সে 'দাদার দুর্দ্দান্ত' এই কথাটা উল্লেখ করতে ভুলতোনা।

ছোট বোনের নালিশ শুনে শ্রীমন্ত এক মিনিট কি ভেবে নিলে। তারপর এগিয়ে এসে বললে, দুর্দ্দান্তের বয়ে গেছে তোর চিংড়িমাছের মুড়ো খেতে। ও ত' আমি তোকে জব্দ করবার জন্যে খেয়ে নিয়েছি। মাংসের হাড় আর দুধ ছাড়া ওর মুখে আর কিছু রোচেনা।

দস্যিপণা

হসন্ত ভ্রু কুঁচ্‌কে বললে, হ্যাঁ, তুমি ত' ওর দোষ ঢাকতে চাইবেই, কিন্তু ও যে আজ হাতে-নাতে ধরা প'ড়ে গেছে। দেখো গে, ঝি ঘর নিকিয়ে গিয়েছিল, কাদার ওপর দুর্দ্দান্তের পায়ের ছাপ স্পষ্ট হয়ে রয়েছে। আমার সঙ্গে চালাকি নয়।

শ্রীমন্ত আর-একটু ফ্যাসাদে পড়লো। কিন্তু মগজে বুদ্ধি আসতে কতক্ষণ? হসন্ত যেই দুর্দ্দান্তকে একটা চ্যালা-কাঠ দিয়ে মারতে উঠেছে, সে থামিয়ে দিয়ে বললে, আরে-আরে, করছিস কি? আমি যখন তোর চিংড়িমাছের মুড়োটা চিবিয়ে-চিবিয়ে খাই সেইসময় দুর্দ্দান্তটা আমার পেছনে-পেছনে ওই ঘরে গিয়েছিল যে। বেচারী একেবারে চোর ব'লে ধরা প'ড়ে গেল। তুই যদি হাকিম হতিস ত' সবাইকে এক-কথায় ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দিতিস···হুঁ।

এই ব'লে শ্রীমন্ত দুর্দ্দান্তকে কোলে টেনে নেয়।

হসন্তের মুখে তখন আর কথাটি নেই।

রাত্তিরে শোবার সময় শ্রীমন্ত অবাক হয়ে দেখে, দুর্দ্দান্ত তার খাটে নেই!···কোথায় আবার গেল দুষ্টুটা।

শ্রীমন্ত চঞ্চল হয়ে উঠলো।

এ-ঘরে সে-ঘরে খোঁজে······না, দুর্দ্দান্ত একবারে উধাও।

মায়ের ঘরে গিয়ে ঘুমন্ত হসন্তকে সে জাগিয়ে তুললে। শুধোলে, হ্যাঁরে, দুর্দ্দান্তকে তুই মেরেছিস?

দুর্দ্দান্তের

কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে দিতে হসন্ত চটে গিয়ে বললে, দুর্দ্দান্ত···দুর্দ্দান্ত···দুর্দ্দান্ত! ওর জন্যে কি একটু ঘুমতেও পারবোনা রাত্তিরে? দুর্দ্দান্ত তোমার জপ-মালা হয়েছে? পরীক্ষার খাতায় ওর নাম একশো আটবার লিখে দিয়ে এসো।

হসন্ত অনর্গল আরো অনেক-কিছু ব'লে চললো। শ্রীমন্ত দেখলে, ওকে ঘাঁটানো বিশেষ সুবিধে হবেনা। তাই তাড়াতাড়ি তাকে শুইয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। হয়তো মাকে ডেকে এক্ষুনি কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাঁধিয়ে বসবে মেয়েটা। ভাগ্যিস বাবা এখনো বাড়ীতে ফেরেননি; তাহ'লে হয়তো আদুরে মেয়েটা ঘুম ভাঙানোর জন্যে গিয়ে নালিশ করেই বসতো।

কিন্তু দুর্দ্দান্তটা গেল কোথায়?

রাত্তিরবেলা ও ত' কোথায়ও বেরোয়না! গভীর রাতে যদি বাইরে কারো পায়ের আওয়াজ পায় অমনি সজাগ প্রহরীর মতো লাফিয়ে উঠে জানলা গলে বাইরেটা একবার টহল দিয়ে আসে।

ভাবতে-ভাবতে শ্রীমন্ত গিয়ে আবার নিজের শোবার ঘরে ঢুকলো, যদি এরই মধ্যে ফিরে বিছানায় গিয়ে চুপ্‌চাপ্‌ শুয়ে থাকে।

নাঃ, দুর্দ্দান্ত সত্যি ভাবিয়ে তুললে।

কিন্তু ও কি! খাটের তলায় নড়ে-চড়ে কে? দুর্দ্দান্ত না থাকায় সুযোগ নিয়ে কোনো চোর এসে ঢুকে আছে না ত'?

দস্যিপণা

কী মুস্কিল! এ যে দুর্দ্দান্ত নিজেই!

শ্রীমন্ত ওকে টেনে খাটের তলা থেকে বের করলে!

অত্যন্ত অপরাধীর মতো কুঁই-কুঁই ক'রে দুর্দ্দান্ত মাথা গুঁজে প'ড়ে থাকতে চায়···কিছুতেই খাটের ওপর উঠবেনা।

শ্রীমন্ত ব্যস্ত হয়ে ভাবলে, কোনো অসুখ-বিসুখ করলো নাকি ওর? তারপর হঠাৎ মনে পড়তেই হো-হো ক'রে হেসে উঠলো। বললে, ও! চুরি ক'রে চিংড়িমাছের মুড়ো খেয়ে বুঝি এখন লজ্জা হয়েছে? কিন্তু খাবার সময় লজ্জাটা ছিল কোথায়, শুনি?

দুর্দ্দান্তের সেই দস্যিপনার ভাব মুখে এতটুকু নেই। ক্রমাগত সে শ্রীমন্তের দু'পায়ে মাথা ঘসতে থাকে। শ্রীমন্ত তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে মাষ্টারমশায়ের ধরনে বললে, খবরদার, আর যেন কখনো চুরি করার কথা না শুনি। শুনলে পরে পিঠ আর আস্তো রাখবোনা, বুঝলে? এইবারকার মতো তোমায় মাফ করা হ'ল। যাও, এখন ক্লাশে গিয়ে বোসো।

দুর্দ্দান্তের মুখ দেখে মনে হ'ল, শাসনের ব্যাপারটা ও ঠিক বুঝতে পেরেছে। এরকম দুষ্টুমী যে ও জীবনে আর করবেনা মুখের ভাবে সেই কথাটাই ও বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলো। আর, তাছাড়া শ্রীমন্ত ওর জন্যে নিজে চোর অপবাদ নিয়েছে, এ কি ওর কম লজ্জার কথা!

কিছুদিনের মধ্যেই দুর্দ্দান্ত একেবারে শ্রীমন্তের ছায়ার মতো হয়ে উঠলো। যখন ইস্কুলে পৌঁছে দেয় তখন ত' কথাই নেই,
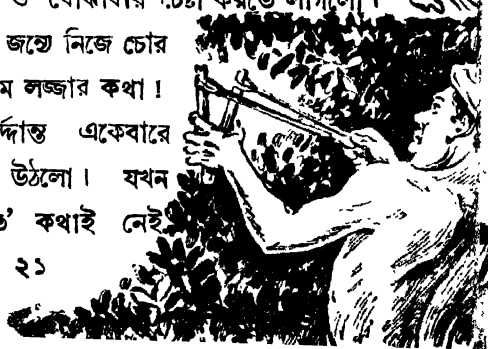
দুর্দ্দান্তের

আবার যখন বিকেলের দিকে ঢং ঢং ক'রে চারটে বাজে, দুর্দ্দান্ত ঠিক মানুষের মতোই উতলা হয়ে ওঠে। সেইসময় যদি তাকে কেউ বেঁধে রাখে তবে সে হয়তো শেকল ছিঁড়েই পালিয়ে ইস্কুলে গিয়ে হাজির হবে। সেখানে তার যে নির্দ্দিষ্ট গাছটি ছায়া ফেলে তারই প্রতীক্ষা করছে সেইখানে গিয়ে সে সাগ্রহে অপেক্ষা করবে—কখন শ্রীমন্ত আর হসন্ত বেরিয়ে আসে।

খুব সকালে দুর্দ্দান্তই শ্রীমন্তের ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। শ্রীমন্তের এর পরের কাজ হ'চ্ছে, খোলা-মাঠে ব্যায়াম করা। সেখানেও দুর্দ্দান্ত ওর প্রধান সঙ্গী। মাঝে মাঝে হসন্ত সখ ক'রে যায় বটে, তবে ছোট মেয়ে, ওদের সঙ্গে আর কতক্ষণ ছুটবে বলো? কাজে-কাজেই শেষপর্য্যন্ত শ্রীমন্ত আর দুর্দ্দান্তই ছুটোছুটি ক'রে গোটা মাঠটা চষে বেড়ায়।

— ৪ —

কিছুদিন পরের কথা।

শ্রীমন্তের মামাতো-ভাইয়ের মুখে-ভাত। শ্রীমন্তের মামা এসেছেন শ্রীমন্তদের নিয়ে যেতে। শ্রীমন্তের মা বললেন, হ্যাঁরে খোকা, তুইতো আমার সঙ্গে যাবি, কিন্তু দুর্দ্দান্তকে ছেড়ে কি থাকতে পারবি?

শ্রীমন্ত বললে, বা রে! দুর্দ্দান্তকে ফেলে রেখে যাবো বুঝি? তাহ'লে ত' ও একা-একা ঘুমুতেই পারবেনা। রাত্তিরে ভয় পেয়ে জেগে উঠবে। ওকে আমরা সঙ্গে নিয়ে যাবো।

মা বললেন, তা ত' হয়না রে! তোর বাবা খালি বাড়ীতে থাকবেন, তাঁকে তাহ'লে পাহারা দেবে কে? যদি হঠাৎ চোর-ডাকাত আসে?

শ্রীমন্ত মাথা দুলিয়ে বুদ্ধিমানের মতো জবাব দিলে, সে ত' ঠিক কথাই মা। তাহ'লে দুর্দ্দান্ত বাবার কাছেই থাক। আমরা ত' কয়েকদিন পরেই নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরে আসবো। কি বলো মা।

মা ছেলের চুলগুলোর ভেতর আঙুল চালাতে-চালাতে বললেন, হ্যাঁ রে! কটা দিনই বা! তোদের আবার ইস্কুল রয়েছে, বেশী দিন ত' আর কামাই করা চলবেনা।

হসন্ত এতক্ষণ মা আর দাদার কথাগুলো

গিলছিল। ভাবলে, তার একটা কথা না বললে ভালো দেখায়না ; তাই গিন্নি-বান্নির মতো মাথা নেড়ে বললে, সে ত' ঠিক কথাই মা !

সেদিন রাত্তিরে শ্রীমন্ত দুর্দ্দান্তকে বেশ ভালো ক'রে বুঝিয়ে দিলে, কেন তাকে মামার বাড়ী নিয়ে যাওয়া হবেনা এবং বাবাকে পাহারা দিতে হবে।

দুর্দ্দান্ত খুব বেশী যে বুঝলে তা ওর মুখের হাব-ভাব দেখে আঁচ করা গেলনা।

শ্রীমন্ত আর হসন্ত এই দেখে অবাক হয়ে গেল যে, যাবার সময় দুর্দ্দান্ত কিন্তু এতটুকু দুষ্টুমী করলেনা।

একটা করুণ বিষণ্ণতা নিয়ে সে চুপ্‌চাপ্‌ বারান্দায় শুয়ে রইলো। শ্রীমন্ত ভেবেছিল ওদের রওনা হবার মুখে গরুর গাড়ীর আশে-পাশে দুর্দ্দান্ত একটা দেখবার আর শোনবার মতো সোরগোল তুলবে। তাদের যাওয়াটাকে লোকের চোখের সামনে বিশেষ দ্রষ্টব্য ক'রে তুলবে। চারদিক থেকে লোকজন ছুটে আসবে মজা দেখতে,—কেউ-বা কুকুরটাকে শান্ত করতে। এইসব হট্টগোলের মাঝখানে দুর্দ্দান্ত যদি দু'একজনকে কামড়ে দেয় তবে রগড়টা জমবে আরো ভালো।

যাত্রার যে চিত্র সে মনে-মনে এঁকে রেখেছিল তা এইভাবে মিইয়ে-যাওয়া ঠাণ্ডা-পাঁপড়ভাজার মতো বিশ্বাসঘাতকতা করলে ব'লে মনে-মনে সে দুর্দ্দান্তের ওপরও ভারী চ'টে গেল। নাহয় বলেছিল ওকে শান্ত-শিষ্ট হয়ে থাকতে, ওর বাবাকে পাহারা দিতে

কিন্তু তাই ব'লে কি মৃদু প্রতিবাদও জানাতে নেই? একটুকু ঘেউ-ঘেউ করলে এমন কী মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেতো?

হসন্ত আবার ফোঁড়ন দিয়ে বললে, দাদার জন্যে ওর ত' বয়েই গেছে। বাবার দেওয়া মাংস খাবে, দুধ খাবে···বাবার সঙ্গে রোজ সকাল-বিকেল বেড়াবে আর বাবার গদীওলা-বিছানার ওপর চমৎকার ঘুমুবে। একপক্ষে ওর প্রমোশন হ'ল বলতে হবে বৈকি!

যে ব্যাপারটা ওর নিজের মনের মধ্যে তোলপাড় তুলেছে, অন্যের মুখে তারি সম্পর্কে ঠাট্টা সে সইতে যাবে কেন? মরিয়া হয়ে শ্রীমন্ত হসন্তের গালে ঠাস্ ক'রে এক চড় কসিয়ে দিলে।

অন্য সময় হ'লে হসন্ত নিশ্চয়ই দেখাতো যে, প্রয়োজন হ'লে সে মুখের হাঁ কতটা বড় ক'রে চীৎকার করতে পারে। কিন্তু যাবার সময়?···ভালো ফ্রক পরেছে, মা টিপ পরিয়ে দিয়েছেন—সেইসঙ্গে একটু পাউডারও···

চোখের জলে একমুহূর্ত্তে সমস্ত 'মেক্‌আপ্' মাটি হয়ে যাবে! আর, তাছাড়া মামা রয়েছে সঙ্গে! সেই-বা কী ভাববে। হয়তো মামা-বাড়ী গিয়ে রসালো ক'রে এইসব গল্প ক'রে তাকে সকলের কাছে একেবারে খাটো ক'রে দেবে। দুর্দ্দান্তকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে সবাইকার সামনে একটা বাহাদুরী নেয়—মনে-মনে এইজাতীয় মতলব যে ওর মনেও ছিলনা সেকথা জেদ ক'রে বলা চলেনা!

সব-সময় ত' সব-কিছু সম্ভব নয়, তাই

ইচ্ছেটাকে যেমনভাবে দমন করেছিল, কান্নাটাকেও সেইভাবে রোধ ক'রে ফেললে। শুধু দাদার ওপর যে সাঙ্ঘাতিক রাগ হয়েছে এইকথা বোঝাবার জন্যে তাকে দেখিয়ে-দেখিয়ে দুর্দ্দান্তকে আর-একবার আদর ক'রে এলো।

কিন্তু দুর্দ্দান্ত কি একেবারে পাথর হয়ে গেল নাকি? ওর লোমশ-দেহে আদরের উচ্ছ্বাস ত' কৈ, এতটুকু জাগলো না।

পশুরাও মাঝে-মাঝে মানুষের মতো নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে কিনা কে জানে!

মামা তাড়া দিয়ে বললে, যাবার মুখে আর কুকুরকে সোহাগ জানাতে হবেনা। ওদিকে বেলা যে ক্রমশঃ চ'ড়ে উঠলো। যা—ওঠ গিয়ে গাড়ীতে; দিদি, তুমি এখনো ঘরের ভেতর খুট্‌খাট্‌ করছো? যাচ্ছো ত' মাত্র এক সপ্তাহের জন্যে। তা এমন ভাব দেখাচ্ছো যে, যেন বিলেত রওনা হবার মুখে সমস্ত-কিছু বিলি-ব্যবস্থা ক'রে তবে রওনা হ'তে হবে।

শ্রীমন্তের বাবা এমনভাবে হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন যে, তাঁর মুখ থেকে হঠাৎ পাইপটাই গেল প'ড়ে।

শ্রীমন্তের মা এসে গাড়ীতে উঠলেন···সঙ্গে-সঙ্গে শ্রীমন্ত আর হসন্ত। শ্রীমন্ত সেই যে চুপ' ক'রে গেল, তারপর ওর মুখ থেকে আর কোনো কথা বেরুলোনা। অবশ্য গরুর গাড়ী যখন মোড় ফিরলো সে আড়-চোখে একবার দুর্দ্দান্তটাকে দেখে নিলে।

কিন্তু বাবার পাইপের ধেঁায়ার আড়ালে সে এমন আত্মগোপন ক'রে বসেছিল যে, ওর দিকে একবার সেইসময় তাকালে কিনা স্পষ্ট ক'রে তাও বোঝা গেলোনা।

গাড়ী এগিয়ে চললো, কিন্তু শ্রীমন্তের চোখ দুটি কেন যেন আপনা থেকেই জলে ভরে এলো। পাছে মামা দেখতে পেয়ে ওকে ক্ষ্যাপায় সেইজন্যে মুখ মোছবার ভান ক'রে সে ক্রমাগত রুমালটা ওর মুখের ওপর দিয়ে নাড়া-চাড়া করতে লাগলো আর এক-ফাঁকে চোখের জলও রুমালে মুছে নিলে।

— ৫ —

মামাবাড়ীতে গিয়ে দেখলে, সে এক যজ্ঞি ব্যাপার।

কত আত্মীয়স্বজন যে এসেছে···সবগুলি ঘর ভর্ত্তী। মামার এই প্রথম সন্তান, আর তাছাড়া দাদামশাই এখনো বেঁচে। প্রথম নাতির মুখ দেখে তিনি একেবারে উৎসাহে শিশুর চাইতেও পুলকিত হয়ে উঠেছেন। আর বেশী দিন বাঁচবেননা, হয়তো তাই সবাইকে নিয়ে তিনি শেষবারের মতো একটু আমোদ-আহ্লাদ ক'রে যেতে চান।

সবগুলি ঘর ভর্ত্তী, কিন্তু শ্রীমন্ত কাউকে চেনেনা! ভেবেছিল এখানে এসে সে কত মজা করবে, কত-কিছু খাবে···যেখানে-সেখানে

বেড়িয়ে বেড়াবে, কেননা, পড়ার চাপ এখানে একদম নেই। কিন্তু শেষপর্য্যন্ত দেখা গেল, কিছুতেই তার মন বসছেনা। হুল্লোড়ের মাঝখান থেকে ও একটু দূরে থাকতে চায়। যাকে সে দূরে ফেলে এসেছে, সে-ই অত্যন্ত কাছের প্রাণী হয়ে সমস্ত মনটাকে জুড়ে বসে।

সেদিন রাত্তিরে খাওয়া হ'তে বড় দেরী হচ্ছিলো। এক-এক ঘরে এক-এক রকম হুল্লোড় চলছে। কেউ গল্প করছে, কেউ তাস খেলছে, কোথাও-বা গানের আসর বসেছে। শ্রীমন্ত চুপি-চুপি নিজেদের ঘরে এসে বিছানার এক কোণে শুয়ে পড়লো। বাড়ীর যে-মেয়েটির ওপর সমস্ত ছেলে-পুলেদের খাইয়ে দেবার ভার ছিল সে বেমালুম ওর কথা ভুলে গেল। শ্রীমন্তকে কেউ আর খেতে ডাকলেনা। ও নিজেও কখন অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে, পেটের ক্ষিদেও সেইসঙ্গে ছুটি নিয়ে পালিয়ে গেছে।

রাত গভীর···শ্রীমন্ত স্বপ্ন দেখছে ঃ

এ-বাড়ীর যত লোক কেউ আর তার দিকে তাকাচ্ছেনা··· যে যার নিজের আমোদ নিয়েই মত্ত। যে মামা আদর ক'রে তাকে বাড়ীতে ধ'রে নিয়ে এলো···তারও টিকিটি দেখবার যো নেই···

হঠাৎ দেখে, সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছে—আর সবাই তার পেছনে লাঠি-সোটা নিয়ে ধাওয়া করেছে। শ্রীমন্ত

ক্রমাগত ছুটতে লাগলো…কিন্তু মজা এই যে, তার পা দুটি কিছুতেই এগুতে চায়না, কে যেন আঠা দিয়ে রাস্তার সঙ্গে আটকে দিয়েছে…ওই ওরা সব এসে ওকে প্রায় ধ'রে ফেললে, এমন সময় হঠাৎ পাশে তাকিয়ে দেখে—দুর্দ্দান্ত।

অবাক কাণ্ড! দুর্দ্দান্ত মানুষের ভাষায় কথা কইলে:

বললে, ভয় কি! আমি রয়েছি পাশে…তুমি আমার সঙ্গে ছোটো ত' দেখি…কেউ তোমার নাগাল পাবেনা।

মনে নতুন বল পেলে শ্রীমন্ত। দু'জনে সমানে ছুটতে সুরু করলে। ওদের বহু পেছনে ফেলে এলো দুটিতে। কত রাস্তা, কত খাল-বিল, কত বন-উপবন…

ওদের দেহ যেন পাখীর পালকের মতো হয়ে গেছে… পা একটু তুলতেই হাওয়ায় ভেসে চ'লে যায়…

শ্রীমন্ত বললে, একটু বিশ্রাম করবিনা ভাই দুর্দ্দান্ত ?

দুর্দ্দান্ত মুচকি হেসে জবাব দিলে, দুষ্টু লোকের দল সব-সময় আমাদের পিছু লাগতে পারে…তাই আমরা চ'লে যাবো …দূরে…বহুদূরে…পৃথিবীর শেষপ্রান্তে। সেইখানে আমরা দুটিতে নিরিবিলি বাঁধবো ঘর। সেখানে গিয়ে কেউ আর আমাদের তফাৎ করতে পারবেনা।

শ্রীমন্ত বললে, সেই ভালো…এইবার চলো, আমরা আবার ছুটি…

দুজনে আবার ছুটতে যাবে, এমন সময় প্রবল ধাক্কায় শ্রীমন্তের ঘুম ভেঙে গেল!

দুর্দান্তের

তাকিয়ে দেখে, দিদিমা তাকে ডাকাডাকি করছেন। তিনি রাগ ক'রে বললেন. কী দুষ্টু ছেলে রে তুই। কাল রাত্তির কখন ঘুমিয়ে পড়িছিলি, কেউ তোকে ডেকে খাওয়ায়নি। তোর মা-টাই বা কেমন? বাপের বাড়ী এসে খালি গল্প আর গল্প। তোর জন্যে পায়েস ঢাকা দিয়ে রেখেছি, খাবি চল...

শ্রীমন্ত ফোঁস ক'রে উঠে বললে, চাইনে আমি তোমাদের পায়েস খেতে। ঘুমের ভেতর আমি কত জায়গা ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। কত নদী, কত বন, কত পাহাড়...ঝরণাও দেখেছি দিদিমা... সিনেমায় যেমনটি দেখায় ঠিক তেমনি।

দিদিমা ঠাট্টা ক'রে বললেন, কার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছিলি, শুনি? স্বপনপুরীর রাজকন্যা আমার নাত্‌বৌ হয়ে এসেছিল বুঝি?

—ধ্যেৎ, তা কেন? শ্রীমন্ত লজ্জা পেয়ে কথাটা ঠেলে দিলে। ...আমি আর দুর্দ্দান্ত। কী ছোটাই ছুট্‌ছিলাম। তুমি ধারণাই করতে পারবেনা। দিদিমা হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, আয় আমার সঙ্গে বাইরে—তোকে অবাক ক'রে দেবো।

শ্রীমন্ত বাইরে এসে নিজের চোখ দুটোকেও অবিশ্বাস ক'রে বসলো। দুর্দ্দান্ত...দস্যি দুর্দ্দান্ত চ'লে এসেছে এখানে! সত্যি কি তবে ও ঘুমের মধ্যে ছুটছিল ওর সঙ্গে? ছুটে গিয়ে শ্রীমন্ত দুর্দ্দান্তকে জড়িয়ে ধরলে। ঘন-ঘন ল্যাজ নেড়ে দুর্দ্দান্ত আনন্দ প্রকাশ করলে।

দস্যিপণা

শ্রীমন্ত মাকে বললে, দেখেছো মা। সেইজন্যে আমাদের আসবার মুখে ও বেশী কথা কয়নি, একেবারে গুম্ হয়ে ছিল। ওর পেটে-পেটে ছিল এই বুদ্ধি···কাজেই আমরা যখন এলুম, রওনা হলুম ··ডাকলুম······কিছুটি বললেনা। ভারী অভিমান হয়েছিল দুর্দ্দান্তের আমরা ওকে নিয়ে আসিনি ব'লে।

হসন্ত দুর্দ্দান্তকে কোলে তুলে নিয়ে বললে, দেখেছো মা, বাবার দেওয়া সেই চেন ছিঁড়ে চ'লে এসেছে। কী দুষ্টু দেখো-দেখি মা!

শ্রীমন্ত শুধোলে, আচ্ছা মা, ... চিনলে কি ক'রে? সোজা রাস্তা ত' নয়—

হসন্ত চোখ দুটো বড়-বড় ক'রে বললে, তাইতো মা। সেকথা ত' একবারও আমার মাথায় আসেনি! রাবণ যখন সীতাকে ধ'রে নিয়ে যায়, রাস্তা চেনবার জন্যে সীতা সমস্ত রাস্তায় গয়না ছড়াতে-ছড়াতে এসেছিল। আমরা ত' দুর্দ্দান্তের পথ চেনবার জন্যে কিছুই ছড়িয়ে রাখিনি···অবাক কাণ্ড মা!

মা বললেন, বইয়েতে তোরা পড়িসনি? কুকুরের অদ্ভুত ঘ্রাণ শক্তি আছে। মানুষ ঠিক ও-রকমটি পারেনা। ওরা লোকের গায়ের গন্ধ শুঁকে-শুঁকে অনেক দূর অবধি গিয়ে তাকে ধ'রে ফেলতে পারে। তোদের দুটিকে ও খুব ভালোবাসে, কিনা, তাই ছেড়ে থাকতে পারেনি। গন্ধ শুঁকে এদ্দুর চ'লে এসেছে

দুর্দান্তের

দুর্দ্দান্ত এইভাবে চ'লে আসায় বাড়ীতে একটা বেশ মজাদার হুলস্থুল প'ড়ে গেল। ছেলে-মহলে ত' দুর্দ্দান্ত রাজার সম্মান পেতে সুরু করলে। কে একটু গায়ে হাত দিয়ে ধন্য হবে, কে কোলে তুলে নিতে পারবে, কে ওকে নিয়ে বেড়াতে যাবে, কে স্নান করিয়ে দেবে···এইসব ব্যাপারে একটা ছোটখাটো রাষ্ট্র-বিপ্লব হবার সম্ভাবনা দেখা দিলে। দুর্দ্দান্ত কিন্তু নির্বিকার মিটিমিটি তাকায় আর মনের সুখে রাজসুখ ভোগ করে। সে এইটুকু বুঝে নিয়েছে যে, যে-কোনো মুহূর্ত্তে একটু কৃপা বর্ষণ ক'রে যে-কোনো ছেলে-মেয়েকে সে [illegible]তে পারে। আর এই ধন্য করবার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হ'য়ে রইলো শ্রীমন্ত নিজে। সেখানে হসন্তেরও বিশেষ জারিজুরী খাটেনা।

আরো মজা হ'ল এই যে, দুদিন বাদে হঠাৎ শ্রীমন্তের বাবা এসে হাজির। শ্রীমন্তের মামা ঠাট্টা ক'রে বললে, ভাগ্যিস দুর্দ্দান্ত পালিয়ে এসেছিল, তাই জামাইবাবুর দর্শন পাওয়া গেল।

হসন্ত বাবার গলা জড়িয়ে ধ'রে বললে, দুর্দ্দান্ত তোমায় খুব জব্দ করেছে, না বাবা ?

ওর বাবা মুচ্‌কি হেসে জবাব দিলেন, জব্দ করার চাইতে ভাবিয়ে তুলেছিল বেশী। প্রথমটা ভাবলাম, কোনো জানোয়ারে-টানোয়ারে ধ'রে নিয়ে গেল না কী। তারপর দেখি, গলার চেন

ছেঁড়া। একটা কাম্‌ড়া-কাম্‌ড়ি, ঝাপ্‌টা-ঝাপ্‌টি হ'লে নিশ্চয়ই ওর ডাক শুনতে পেতাম। তা যখন নয়, তখন নিশ্চয়ই পালিয়েছে।

শ্রীমন্ত শুধোলে, আমরা চ'লে আসবার পর দুর্দ্দান্ত ত' তোমার কাছেই থাকতো বাবা!

ওর বাবা বললেন, সেই ত' গোলযোগ। কিছুতেই আমার বিছানায় শোবেনা। দু'দিন ত' কিচ্ছুটি খেলেনা, শুধু নাক দিয়ে শুঁকে ঠেলে রেখে দিতো। ঘরে কিছুতেই থাকতোনা। তোরা যে পথ ধ'রে এসেছিস সেই পথের দিকে খালি তাকিয়ে থাকতে চায়। বাধ্য হয়ে তখন জানলার পাশে ওর থাকবার একটা ব্যবস্থা ক'রে দিলাম। মনে-মনে ভয় আমার একটা ছিলই, তাই রাত্তিরে শেকল দিয়ে রেখে দিতাম। কিন্তু ও যে শেকল ছিঁড়ে জানলা গ'লে পালিয়ে আসবে তা কিন্তু আমি ভাবিনি। কাজেই, চেন ছেঁড়া দেখেই অতি সহজে ধ'রে নিলাম যে, দুর্দ্দান্ত শ্রীমন্তকে খুঁজতে চ'লে এসেছে।

হো-হো ক'রে তিনি প্রাণ-খোলা হাসি হাসতে লাগলেন। তাঁর স্ফূর্ত্তি দেখে মনে হ'ল—ব্যাপারটায় তিনি ভারী খুশী হয়েছেন। যাক, শেষপর্য্যন্ত একটা অভিযান ত' হ'ল।

এইবার ফিরে আসবার পালা।

আত্মীয়স্বজনদের চাইতে ছেলে-মহলে একটা বিক্ষোভের স্মৃষ্টি হ'ল বেশী। ওখানকার হাইস্কুলের ছেলেদের কিন্তু উদ্যমের প্রশংসা করতে হবে। তারা দুর্দ্দান্তের বিদায়-সম্ভাষণের

দুর্দ্দান্তের

জন্যে একটি অনুষ্ঠানেরই আয়োজন ক'রে বসলো। ও-অঞ্চলে যত ছেলে-মেয়ে ছিল সবাইকে এই উপলক্ষে আমন্ত্রণ জানানো হ'ল। এইজাতীয় একটি পরিকল্পনা একেবারেই অভিনব। দুর্দ্দান্ত যেন একটা যুদ্ধ জয় ক'রে এসেছে এবং আর-একটি যুদ্ধ জয় করতে যাচ্ছে এমনি তার সম্মান আর খাতির।

স্থির হ'ল যে, ছোটো-খাটো একটি ছেলেদের নাটক অভিনয় করা হবে এবং তাতে দুর্দ্দান্তেরও পার্ট থাকবে। শ্রীমন্ত রাতারাতি এইজাতীয় একটি শিশু-নাটিকা লিখে ফেললে এবং তার নাম দেওয়া হ'ল—"দুর্দ্দান্তের অভিযান"।

কয়েকদিন ধ'রে অভিনয়ের মহলা চললো ইস্কুলবাড়ীর গ্রন্থাগারে। দুর্দ্দান্ত তাতে নিয়মিত হাজিরা দেয় আর ছেলেদের হাত থেকে বিস্কুট খেয়ে তাদের কৃতার্থ করে।

হসন্ত বললে, অভিনয় ত' হবে, কিন্তু দুর্দ্দান্তের যে কোনো ভালো পোষাক নেই, কি প'রে ও ষ্টেজে নামবে ?

শ্রীমন্ত বললে, ঠিক বলেছিস। আমার মাথায় একটা চমৎকার কল্পনা আছে, সেইরকম একটা পোষাক তুই তৈরী ক'রে দে।

হসন্ত আর বাড়ীর অন্যান্য মেয়েরা এতে উৎসাহিত হয়ে উঠলো। শুধু তাই নয়, সাড়ীর পাড় জোড়া দিয়ে-দিয়ে তারা এমন চমৎকার একটি পোষাক তৈরী ক'রে ফেললে যে, ছেলেদেরও দেখে মনে-মনে হিংসা হ'ল। দুর্দ্দান্ত আড়চোখে ব্যাপারটা দেখে ঘন-ঘন ল্যাজ নাড়তে লাগলো।

— ৬ —

তারপর এলো সেই অভিনয়ের স্মরণীয় সন্ধ্যা। ছোট-খাটো একটি ষ্টেজ খাটানো হয়েছে। তার ভেতরে গাছপালা আর মাটি সাজিয়ে চমৎকার একটি পাহাড় তৈরী করা হ'ল। এরই ওপর দিয়ে চলবে দুর্দ্দান্তের অভিযান।

জমিদারবাড়ী থেকে চেয়ে এনে ডে-লাইট ঝুলিয়ে দেওয়া হ'ল। বাইরে দেবদারু পাতা আর লাল-নীল কাগজের শেকল ঝুলতে লাগলো। ওপরে শালুর ওপর তুলো দিয়ে লেখা:

"দুর্দ্দান্তের অভিযান"

প্রথম দৃশ্যে একদল ছেলে নিশান হাতে অভিযানের গান গাইতে-গাইতে চ'লে যাবে। তারপর আসবে দুর্দ্দান্ত। মুখে ঝুলবে তার একটি লণ্ঠন···অপরূপ তার পোষাক···পিঠে একটা ব্যাগ···

গান গাওয়ার দৃশ্য শেষ হয়ে গেল। এরপর একটা পর্দ্দা প'ড়ে গেল—নতুন দৃশ্য সুরু হবার জন্যে।

ছেলের দল ভালো ক'রে ন'ড়ে-চ'ড়ে বসলো। প্রথমদিকে বসেছেন—মেয়েদের দল; একপাশে অভিভাবকের দল, তারপর গোটা জায়গাটাই দখল ক'রে নিয়েছে ছেলেরা।
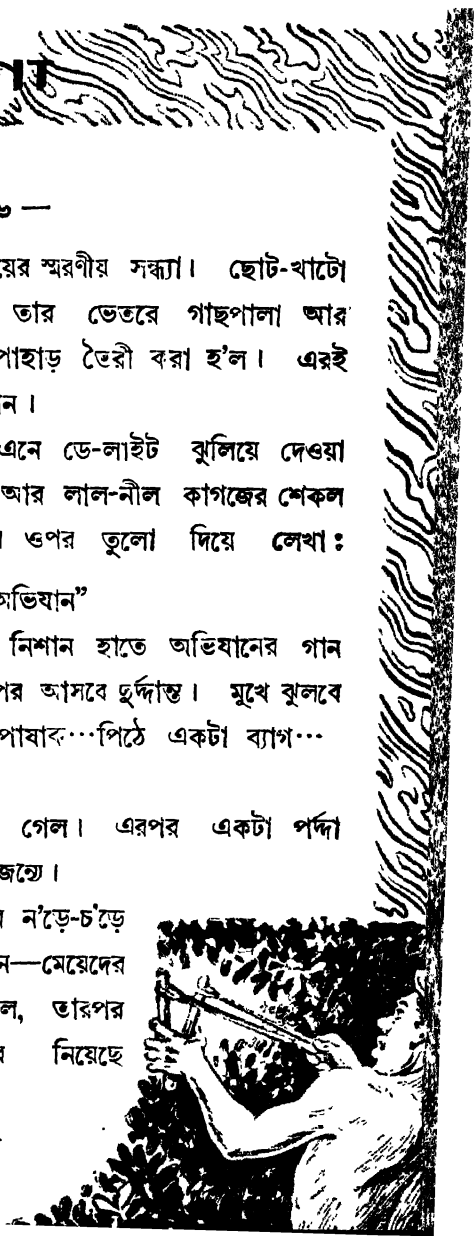
অভিযানের ব্যাণ্ডবাদ্য বেজে উঠলো। ফু—র্—র্—র্ ক'রে বাঁশী বাজলো ভেতর থেকে। স'রে গেল পর্দ্দা।

এইবার আসবে এই নাটকের নায়ক—দুর্দ্দান্ত। ছেলের দল চোখ দুটো বড়-বড় ক'রে তাকিয়ে রইলো।

হ্যাঁ, ওই ত' দুর্দ্দান্ত। অপরূপ পোষাকে তাকে চেনাই যায়না। গোটা ষ্টেজটা অন্ধকার, শুধু তার মুখে-ধরা লণ্ঠনে যেটুকু আলো পড়েছে তাতে চমৎকার দেখাচ্ছে তাকে।

ছেলের দল মহা উৎসাহে হাততালি দিয়ে উঠলো। দুর্দ্দান্ত সামনে এতগুলো কালো মাথা দেখে ভড়কে গিয়ে লণ্ঠন ফেলে চোঁ-চোঁ দৌড়! ছেলেরা হৈ-হৈ ক'রে উঠলো।

দুর্দ্দান্ত ততক্ষণে শ্রীমন্তর মার কোলে আশ্রয় নিয়েছে!

দস্যিপনা

— ৭ —

বাড়ীতে ফিরে শ্রীমন্ত আবার ভালো ছেলের মতো লেখাপড়ায় মন দিলে। দুর্দ্দান্তের দস্যিপনা তাতে যেন একটু কমে গেল।

সারা দিনের মধ্যে শ্রীমন্তকে আর পাবার যো নেই। সকালবেলা মাঠে ছুটোছুটি চলে আর বিকেলবেলা যায় ইস্কুল থেকে আনতে। শ্রীমন্ত থাকে সারাদিন ইস্কুলে বন্দী আর দুর্দ্দান্ত ঘরের ভেতর ছট্‌ফট্ ক'রে মরে।

শ্রীমন্ত যখন সকাল-সন্ধ্যে বই-খাতা-পত্তর নিয়ে পড়তে বসে, দুর্দ্দান্ত তার কাছটি ঘেঁষে এসে বসে। ঘন-ঘন ওর মুখের দিকে তাকায় আর জিবটা ল্যা-ল্যা করে। ওকে জিজ্ঞেস করবার এই মতলব যে, কী আজে-বাজে বিড়্‌বিড়্ করছো? তার চাইতে চলো, মাঠে গিয়ে খানিকক্ষণ ছুটোছুটি আর খেলাধূলো করা যাক।

কিন্তু শ্রীমন্তই-বা সেকথা শোনে কি ক'রে? তক্ষুনি মাষ্টারমশাই আসেন দুটি ভাই-বোনকে পড়াতে। তিনি আবার গোঁড়া ব্রাহ্মণ, কুকুর একেবারে সহ্য করতে পারেননা। এসেই বলেন, ওগো খোকা-খুকু, তোমরা তোমাদের বাহনটিকে আগে শেকল দিয়ে বেঁধে রেখে এসো ত'! ও থাকলে তোমাদের পড়াশুনা যা হবে সে ত' বুঝতেই পাচ্ছি!

দুর্দ্দান্তের এক-একবার মনে হয়, ছুটে গিয়ে
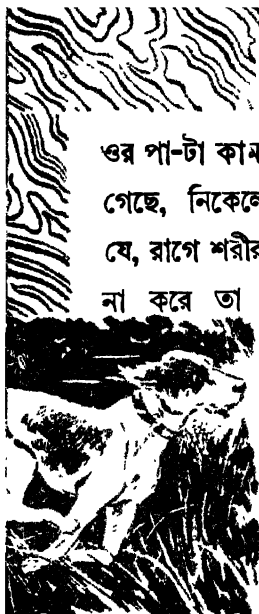
ওর পা-টা কামড়ে ধরে।··· চোখটা কোটরে বসা, গালটা চুপ্‌সে গেছে, নিকেলের চশমার ফাঁক দিয়ে এমন বিচ্ছিরীভাবে তাকায় যে, রাগে শরীরটা রি-রি করতে থাকে। দাঁতও যে কিড়্‌কিড়্‌ না করে তা নয়। তবে ওকে কিছু বললে, উল্টে শ্রীমন্তেরই যে মার খেতে হবে একথা সে মনে-মনে আঁচ ক'রে-নিয়েছিল, তাই অনেক ক'রে রাগটাকে চেপে রাখে।

আর-একটি লোককে সে সইতে পারেনা সে হ'চ্ছে, বামুনঠাকুর। এক-এক সময়, রান্নাঘর থেকে এমন চমৎকার গন্ধ বেরোয় যে ওদিকে একবার না গিয়ে উপায় থাকেনা। লোকটা এত ভালো রান্না করে, কিন্তু এমন চোয়াড়ে কেন?···ওকে দেখলেই খুন্তি নিয়ে তাড়া করে। আড়ালে-টাড়ালে পেলে দু'-এক ঘা লাগিয়ে দিতেও কসুর করেনা। ওর কপালে একদিন কামড়-খাওয়া আছে নির্ঘাৎ। যেদিন দুর্দ্দান্ত সত্যি চটে যাবে সেদিন আর কিছুতেই রেহাই দেবেনা এই বামুনঠাকুরকে।

সামনে একটা পুকুর আছে। সেখানে মাঝে-মাঝে সাঁতার কাটলে মন্দ হয়না, কিন্তু একা-একা কি আর ওই-সব কাজ ভালো লাগে। শ্রীমন্ত এক-একদিন ওকে ঠেলে ফেলে দেয় পুকুরের অনেকটা ভেতরে। হয়তো তার আগে ছুঁড়ে দেয় গামছাটা কিম্বা একটি বল। ও বিদ্যুৎগতিতে গিয়ে সেগুলো উদ্ধার ক'রে নিয়ে আসে। এই খেলাটা ওর বেশ ভালো লাগে।

দস্যিপণা

শ্রীমন্ত সাঁত্‌রায়…দুর্দ্দান্তও সঙ্গে-সঙ্গে চলে। কিন্তু হঠাৎ নাকে জল ঢুকে গেলেই মুস্কিল। হ্যাঁচ্চো, হ্যাঁচ্চো ক'রে প্রাণ একেবারে অস্থির হয়ে ওঠে। ওধারের বটগাছের ওপর কতকগুলো পাখী বাসা বেঁধেছে। দু'একটার ঘাড় মট্‌কালে কি রকম হয় সেকথা দুর্দ্দান্ত অনেক সময় ব'সে-ব'সে ভাবে। একবার গিয়েছিল বেড়াতে-বেড়াতে ওইদিক পানে। পাখীগুলো গায়ে খড়কুটো ফেলে দেয় আর ঠোক্‌রাতে আসে।

এদিকে দালানের ফোঁকরে কতকগুলো জংলা পায়রা বাসা বেঁধে ছিল। দুর্দ্দান্তের মতলব ছিল তারি একটার একদিন সদ্ব্যবহার করবে। শ্রীমন্তের মা বলেছেন, ওরা নাকি ঘরের লক্ষ্মী। ওদের তাড়াতে নেই, কিম্বা কোনো অনিষ্ট করতে নেই। কিন্তু লোভটা দিনকে-দিন যেমন বেড়ে যাচ্ছে আর জিবটা সুড়সুড় করছে, তাতে কতদিন যে সে শান্ত-সুবোধ-শিষ্ট হয়ে থাকতে পারবে বলা শক্ত। পায়রার মাংস খেতে বেশ লাগে কিন্তু। জংলা-পায়রার ঘাড় মট্‌কে খাওয়াতে যে মজা আছে, মানুষেরা সেকথা কি ক'রে বুঝবে বলো? ওরা যে রোজ মাছ খায় তাতে বুঝি আর কোনো দোষ হয়না?

দুর্দ্দান্ত মনে-মনে ভাবলে, আজকে একটি জংলা-পায়রা দিয়ে জলযোগ সমাধা করতে হবে। এই ভেবে এক-পা দু'পা ক'রে বাড়ীর দিকেই এগিয়ে গেল। তখন সূর্য্যের রোদ বেশ প'ড়ে গিয়েছে আর সন্ধ্যেটা দিব্যি

আসছে ঘনিয়ে। আরো কিছু-সময় অপেক্ষা করতে হবে, কেননা আঁধারটা জমাট বাঁধলে পায়রার দল চোখে কিছু দেখতে পায়না ; ওদের ধরবার পক্ষে সেই হ'চ্ছে সুবর্ণ-সুযোগ।

সেই ফাঁকে ওদিকটাও একবার ঘুরে আসা দরকার। বারান্দা ধ'রে সে চুপি-চুপি এগিয়ে গেল। শ্রীমন্তের মা লক্ষ্মীর ঘরে সন্ধ্যে-বাতি দিচ্ছেন। সামনের কোণের ঘরটায় এরই মধ্যে শ্রীমন্ত আর হসন্ত প্রদীপ জ্বেলে পড়তে বসেছে। জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলে, তাদের দুজনের লম্বা-লম্বা ছায়া দেয়ালের গায়ে দুলছে। মাষ্টারমশাই অবশ্য তাঁর বেতের লাঠি ঠক্‌ঠক্‌ করতে-করতে এখনো এসে হাজির হননি ; এইসময় পড়বার ঘরে ঢুকে খানিকটা হুটোপুটি যে ওদের সঙ্গে করা না যায় তা নয়। কিন্তু মুস্কিল ওই চশমা-চোখে মাষ্টারমশাইকে নিয়ে। এমন ক'রে এসে হুমকি দেবেন যে, সহ্য করা শক্ত। কাজ নেই বাবা—দূরে-দূরে স'রে থাকাই ভালো।

ইতিমধ্যে অন্ধকারটা আরো জমাট বেঁধে উঠেছে, ঝোপে-ঝাড়ে জোনাকীগুলো আগুনের হরির লুট ছড়াতে সুরু করেছে। রান্নাঘর থেকে বামুনঠাকুরের ছ্যাঁক-ছোঁক শব্দ ভেসে আসছে। কুকুরদের যদি পাঁজি থাকতো তবে নিশ্চয়ই তাতে ছাপানো থাকতো যে, জংলী-পায়রার ঘাড় মট্‌কাবার এই হ'চ্ছে মাহেন্দ্রক্ষণ।

দুর্দান্ত এইবার সত্যিই দুর্দান্ত হয়ে উঠলো। সামনের পা দুটো

দস্যিপণা

শানের ওপর একবার ঘসে নিলে, কান দুটো একবার দুলিয়ে খাড়া ক'রে ফেললে ; চোখ দুটো হয়ে উঠলো সজাগ, আর সেইসঙ্গে চরণ এগিয়ে চললো দুর্নিবার কিসের একটা লোভনীয় এবং মোহময় আকর্ষণে। অন্ধকারের ভেতর তারপর আর কিছু দেখা গেলনা, শুধু পায়রাদের সমবেত বকম্‌-বকম্‌ আর ঝটপট আওয়াজ…

একটির ঘাড় কামড়ে ধ'রে দুর্দ্দান্ত বারান্দার অন্ধকার-কোণে আশ্রয় নিলে। পায়রাটা তখনো একেবারে মরে যায়নি, মরণ-যন্ত্রণায় শেষবারের মতো মুক্ত হবার একটা প্রচেষ্টা করছে।

শ্রীমন্তের মা লক্ষ্মীর ঘরে ধূপ-ধূনো দিয়ে, লণ্ঠন হাতে সেই বারান্দা ধরেই আসছিলেন। একটা হুটোপুটির শব্দ শুনে তিনি লণ্ঠনটা উঁচু ক'রে ধ'রে দুর্দ্দান্তের দস্যিপনা দেখে একেবারে চীৎকার ক'রে উঠলেন। ঠিক সন্ধ্যেবেলা এমন রক্তারক্তি কাণ্ড! এ কী অলক্ষুণে ব্যাপার!

দুর্দ্দান্ত যে এমন হাতে-নাতে ধরা পড়বে সেকথা সে আদপেই ভাবেনি, নইলে, বারান্দা থেকে নেমে একটু ঝোপ-জঙ্গলে কি আর যেতে পারতোনা!

মায়ের চীৎকার শুনে বই-পত্তর ফেলে ছুটে এলো শ্রীমন্ত, পড়ি-কি-মরি ক'রে লাফাতে-লাফাতে এলো, হসন্ত।

বললে, কি হয়েছে মা? অমন ক'রে চ্যাঁচাচ্ছো কেন?

মা বললেন, চ্যাঁচাবো না? ভর-সন্ধ্যেবেলা
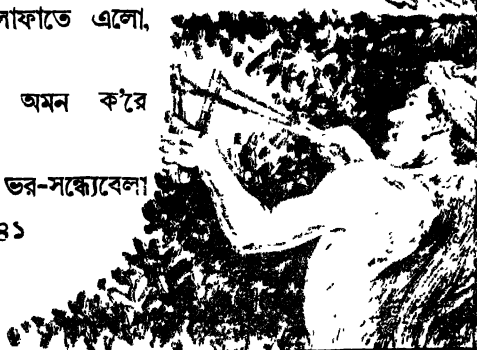
দুর্দ্দান্তের

এই রক্তারক্তি বাড়ীর ভেতর। একটা অমঙ্গল এবার ঘটবেই এ-বাড়ীতে।

শ্রীমন্ত এগিয়ে এসে ততক্ষণে দুর্দ্দান্তের কাণ্ডটা দেখেছে। ব্যাপারটাকে সহজ ক'রে তোলবার জন্যে মায়ের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে জবাব দিলে, এতেই তুমি মা এত হকচকিয়ে উঠলে? শিকারী কুকুর—একটু শিকার করবেনা? ভারী ত' একটা পায়রা মেরেছে। হাতের তাক্ ঠিক না থাকলে ও রাত্তিরে চোর ডাকাত ধরবে কি ক'রে?

মা কোনো কথা বললেননা, শুধু শব্দ করলেন, হু। শ্রীমন্ত বুঝলে, মায়ের রাগটা এখনো পড়েনি, তাই আরো ঘনীভূত হয়ে মায়ের গলা জড়িয়ে ধ'রে বললে, আচ্ছা মা, তুমি বাঘকে কি নিরিমিষ খাইয়ে রাখতে চাও? যার যা খাদ্য। ওকে রক্তের স্বাদ দিতেই হবে।

মা বিরক্তির সুরে কইলেন, তা, মাংস কি ও খাচ্ছেনা? ভর-সন্ধ্যেবেলা, বেস্পতিবার…এমন অলক্ষুণে কাণ্ড! না বাপু, আমার কিন্তু একটুও ভালো লাগছে না—এই ব'লে তিনি আবার লক্ষ্মীর ঘরের দিকে চ'লে গেলেন।

— ৮ —

সেইদিনই গভীর রাত্রে ওর বাবা ফিরে এলেন। ওরা তখন ঘুমিয়ে। অনেক রাত্তিরে ঘরের ভেতর কথা শুনে শ্রীমন্তের ঘুম ভেঙে গেল। একটা ছোট মাটির প্রদীপ ঘরের এক কোণে শুধু জ্বলছিল। মা আর বাবা মুখোমুখি ব'সে।

জানলা দিয়ে হাওয়া এসে বাতিটিকে এক-একবার নিভিয়ে দেবার মতো ক'রে তোলে, মা হাতের আড়াল দিয়ে আবার তাকে বাঁচিয়ে তোলেন।

মা বললেন, আমি আগেই বুঝেছিলাম আজ একটা অমঙ্গল কিছু ঘটবে। লক্ষ্মীর ঘরে প্রদীপ দিয়ে বারান্দায় বেরিয়েছি··· একেবারে চোখের সামনে পায়রাটার ঘাড় মট্‌কে দিলে।

বাবা সে-কথায় বিশেষ কোনো কান দিলেন ব'লে মনে হ'লনা। শুধু মৃদুস্বরে বললেন, আমার সমস্ত কারবার একদিনে ডুবে গেল। আজ আমি একেবারে পথের ভিখিরী—

মা সান্ত্বনার সুরে কইলেন, গিয়েছে আবার হবে, ভয় কি? আমার গায়ের গয়না ত' রয়েছে—

বাবা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে জবাব দিলেন, হুঁ। গায়ের গয়না! ও ত' দেনা শোধ করতেই হাওয়া হয়ে উড়ে যাবে। আমি নিজের জন্যে তত ভাবছিনে, কিন্তু দুঃখ এই যে,

দুর্দান্তের
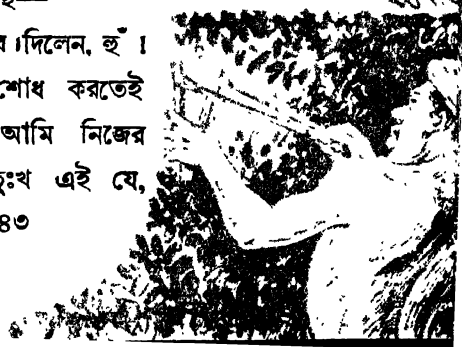
ছেলেমেয়ে দুটিকে মানুষ ক'রে রেখে যেতে পারলামনা। আমি আর ক'দিন ?

মা বললেন, এতটা হতাশ তুমি হয়োনা। ভগবান কি এমনি করেই আমাদের মারবেন ? আমরা তো কারো কোনো অপকার করিনি। না-না, আমার মন বলছে আবার আমাদের সব হবে। অনেক রাত হয়েছে। তুমি একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো দেখি—এই ব'লে তিনি ফুঁ দিয়ে ঘরের প্রদীপ নিভিয়ে দিলেন। তারি মাঝে বাবার আর-একটি দীর্ঘ নিশ্বাস শোনা গেল।

পরদিন অনেক বেলায় শ্রীমন্তের ঘুম ভাঙলো। আজ এত দেরী ক'রে ওঠবার জন্যে কেউ তাকে বকলেনা। চোখ কচলে উঠে দেখে, মুখ গম্ভীর ক'রে বাবা ঘরের এক কোণে চেয়ারে ব'সে গুড়ুক-গুড়ুক তামাক টানছেন। অন্যদিন হ'লে বেশ খানিকটা বকুনী খেতে হ'তো। কিন্তু বাবা তার দিকে ফিরেই তাকালেননা। শ্রীমন্ত ধীরে-ধীরে বাইরে চ'লে এলো।

অন্যান্য দিন মা সকালবেলা স্নান ক'রে অনেকটা বেলা অবধি লক্ষ্মীর ঘরে পূজোতে কাটান। আজ তাঁর কোনো পাত্তাই পাওয়া যাচ্ছেনা। চাকরটা বললে, তিনি নাকি ঘাটে গিয়ে কাপড় কাচতে বসেছেন।

ঝি এসে বললে, দাদাবাবু, তোমাদের খাবার ঐ পাশের ঘরে ঢাকা দেওয়া আছে, খেয়ে নিয়ে পড়তে ব'সো গে। মার ঘাট থেকে ফিরতে আজ দেরী হবে।

দাস্যিপণা

শ্রীমন্ত জানে এমনটি কখনো হয়না। মা নিজে-হাতে খাবার না দিলে ওরা কি কখনো খেয়েছে? ভারী অভিমান হ'ল তার মনে না খেয়েই সে পড়বার ঘরে গিয়ে বসলো।

হসন্ত ব'সে-ব'সে একটা বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিলো। দাদাকে দেখেই ছুটে এসে বললে, জানিস দাদা, বাবা আজ মাষ্টারমশাইকে আসতে বারণ ক'রে দিয়েছে। এখন থেকে আমরা ছু'জনে নাকি নিজেরাই পড়বো।

এত বড় একটা মুখরোচক সংবাদ পেয়েও শ্রীমন্ত খুশী হবার কোনো নমুনা দেখালেনা। এইজাতীয় একটি খবর শুনে অন্য দিন সে তার সমস্ত খেলনা আর ঘুঁড়ি অবলীলাক্রমে হসন্তর হাতে তুলে দিতে পারতো।

হসন্তরও যেন ব্যাপারটা আগাগোড়া হেঁয়ালীর মতো মনে হচ্ছিলো। সকালবেলা উঠেই মনে হয়েছিল, বাড়ীটা একদিনে সব বদ্‌লে গেল নাকি? এক ভরসা ছিল, দাদা। তা, তারও মুখ এমনি গম্ভীর? হসন্ত বুঝতে পারছিলনা যে, সে সত্যি ঘুম থেকে উঠেছে, না, এখনো বিছানায় শুয়ে-শুয়ে স্বপ্ন দেখছে। আপন মনে সে নিজের গায়ে একটা চিম্‌টি কেটে নিলে।

—নাঃ, সত্যি লাগে যে।

সারাটা সকাল ওদের কেমন যেন একভাবে কেটে গেল।

এ-ওর মুখের দিকে তাকায়, ও-এর চোখের দিকে ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ ক'রে চেয়ে থাকে।
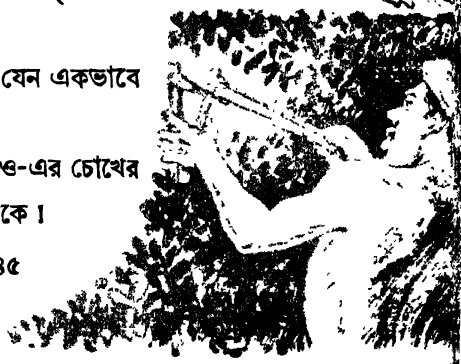
দুর্দান্তের

বামুনঠাকুর এসে বললে, দাদাবাবু, দিদিমণি, তোমরা তাড়াতাড়ি স্নান ক'রে এসো···আমি ভাত দিয়ে যাবো, আজ থেকে আমার জবাব হয়েছে। আবার অন্য একটা চাকরি জোগাড় করতে হবে ত'!

হসন্ত কিছু বুঝতে পারেনা, দাদার মুখের দিকে তাকায়। কিছু জিজ্ঞেস করবার সাহসও ওর মন থেকে উপে গেছে!

শ্রীমন্তের মনে জাগে রাত্তিরে-শোনা মা-বাবার টুকরো-টুকরো কথা। সব কথা মনে নেই! আধো-ঘুম, আধো-জাগা অবস্থায় শোনা। মগজে ওর কিছু ঢুকেত চায়না, সব-কিছু গুলিয়ে যায়।

দুর্দ্দান্তটাও এ-সময়ে কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে। ও যে খুব একটা কিছু অপরাধ ক'রে ফেলেছে সেটা যেন সে বুঝতে পেরেছে। সেইজন্যে মুখ দেখাতেও তার বুঝি লজ্জা করছে। কিন্তু ইস্কুলে ওদের যেতেই হবে। সেই বুঝি ওদের একমাত্র ভুলে থাকবার জায়গা। নইলে, বাড়ীতে থাকলে ভাই-বোনে বোধহয় দম বন্ধ হয়ে মারাই যাবে।

গুটি-গুটি গিয়ে স্নান ক'রে, যাহোক একটু কিছু মুখে দিয়ে ওরা ইস্কুলের দিকে রওনা হ'ল। খানিক দূর যাবার পর অবাক হয়ে দেখে, একটা ঝোপের আড়াল থেকে দুর্দ্দান্ত বেরিয়ে আসছে।

তাহ'লে দুর্দ্দান্তটা ভয়ে-ভয়ে এইখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে? হসন্ত শুধোলে, আচ্ছা দাদা, ব্যাপারটা কি বলো ত'? বাবা ফিরে এলো, আমাদের সঙ্গে একটা কথা অবধি বললেনা। দুর্দ্দান্তটা

অবধি ভয় পেয়ে জঙ্গলে এসে লুকিয়ে রয়েছে। আমাদের বাড়ীতে কি ভূতের ভয় হ'ল ?

শ্রীমন্ত সে কথার জবাব দিলেনা, শুধু দুর্দ্দান্তর দিকে তাকিয়ে বললে, আয়রে—আমাদের সঙ্গে। তোর কিছু খাওয়া হয়নি বুঝি?

দুর্দ্দান্ত অসহায়ের মতো শুধু ল্যাজ নাড়তে লাগলো। ওর চোখের কোণে কি জল? কোলে তুলে নিয়ে ওরা দু'জনে ওকে আদর করলে। হসন্ত বললে, আমার পেন্সিলের বাক্সে চারটে পয়সা আছে দাদা, চলো, ইস্কুলে গিয়ে দুর্দ্দান্তকে বিস্কুট কিনে দেবো।

শ্রীমন্ত বললে, সেই ভালো রে—চল্ আমরা যাই।

ইস্কুলের দোর-গোড়ায় বিস্কুটওয়ালার কাছ থেকে বিস্কুট কিনে দুর্দ্দান্তকে ওরা দিলে।

শ্রীমন্ত বললে, যা, বাড়ী গিয়ে থাক্‌গে। মা-বাবা তোকে কিছু বলবেনা রে! আমরা তো ছুটির পরেই যাচ্ছি।

দুর্দ্দান্ত ল্যাজ নাড়তে লাগলো। কি বুঝলে তা সেই জানে!

সেদিন শ্রীমন্ত আর হসন্তের সারাটা দিন ইস্কুলে বড় অসোয়াস্তিতে কাটলো। পড়ুয়াদের সঙ্গে ওরা হেসে কথা বলতে পারলেনা। মাষ্টারমশাই কি পড়াচ্ছেন সেদিকে ওদের মন যায়না, থেকে-থেকে শুধু বাড়ীর কথা মনে হয়। মা কি করছেন, বাবা কি সেইভাবেই আজ সারাটা দিন ব'সে আছেন—এইসব প্রশ্ন ওদের মনের দোরে কেবলি উঁকি মেরে যেতে লাগলো।

দুর্দ্দান্তের

টিফিনের ছুটিতে অন্যান্য দিন বাড়ীর ঝি কিম্বা চাকর এসে দুধ-মিষ্টি দিয়ে যায়। আজ তাদের টিকিটি পর্য্যন্ত দেখবার যো নেই। মা দুজনকেই জবাব দিয়ে দিয়েছেন কিনা কে জানে।

হঠাৎ হসন্ত ব'লে উঠলো, দেখেছো দাদা, দুর্দ্দান্ত এসে গাছের তলায় ব'সে আছে।

ছেলেদের ভীড় ঠেলে ওরা গাছতলায় দুর্দ্দান্তের কাছে গিয়ে হাজির হ'ল। দুর্দ্দান্তের মুখে একটা পুঁটলী। হসন্ত তাড়াতাড়ি খুলে নিয়ে দেখে, তার ভেতর রুটি আর তরকারি।

শ্রীমন্ত বললে, এখন থেকে দুর্দ্দান্তই রোজ আমাদের খাবার নিয়ে আসবি, না রে ?

দুর্দ্দান্ত ল্যাজ নেড়ে সম্মতি জানালে।

হসন্ত বললে, এ ভালোই হ'ল দাদা। ঝি-চাকরে বড় দেরী করতো। এক-একদিন টিফিনের ঘণ্টা বেজে যেতো তবু তাদের দেখাই নেই। দুর্দ্দান্ত কিন্তু কখনো দেরী করবেনা।

শ্রীমন্ত তার বোনটিকে খুশী করবার জন্যে বললে, হ্যাঁ রে, সেই ত' ভালো। দুর্দ্দান্ত আমাদের সব কাজ করবে। দরকার নেই আমাদের ঝি-চাকরের। আজ আছে, কাল নেই। যাক চ'লে ওরা।

শ্রীমন্ত জিজ্ঞেস করলে, হ্যাঁরে দুর্দ্দান্ত, রুটি আর তরকারি মা ক'রে পাঠিয়েছে, না রে ?

হসন্ত জিজ্ঞেস করলে, দুর্দ্দান্ত, তুই বাড়ী গিয়ে খেয়েছিলি ত' ?

দুর্দ্দান্ত ল্যাজ নেড়ে সম্মতি জানালে।

দস্যিপণা

পুটলীটা দুর্দ্দান্তের মুখে গুঁজে দিয়ে ভাই-বোনে ছুটতে-ছুটতে ইস্কুল-ঘরে এসে হাজির হ'ল। ততক্ষণে টিফিনের ঘণ্টা বেজে গেছে। মাষ্টারমশাই ক্লাশে এসে হাজির হয়েছেন। তিনি ওদের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন, কিন্তু কিছু বললেননা।

এ-বেলাটা ভাই-বোনের বেশ ভালোই লাগলো। মনের ওলট্‌-পালটটা ওরা অনেকটা সামলে নিয়েছে। নাই-বা থাকলো চাকর আর ঝি···ওদের মতো দুর্দ্দান্ত ক'জনের আছে?

চারটের সময় ঢং ঢং ক'রে ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে ভাই-বোনে বই-পত্তর নিয়ে বাইরে ছুটে এসে দেখলে, দুর্দ্দান্ত ঠিক গাছতলায় হাজির আছে।

ওদের তিনজনের মিলতে বেশী দেরী হ'লনা। দুর্দ্দান্ত চলছে বই-পত্তর মুখে নিয়ে আগে-আগে আর শ্রীমন্ত ও হসন্ত চলছে পেছনে-পেছনে। দুর্দ্দান্ত থেকে-থেকে কি রকম যেন একটা কান্নার সুরে তাদের কী বোঝাতে চেষ্টা করে···তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে বাড়ীর দিকে আসবার ইঙ্গিত জানায়।

ওরা পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চায়, কিন্তু কিছু বুঝতে পারেনা। অন্যান্য দিন যাবার পথে ওদের কত খেলা চলে। আজ যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছে। দুর্দ্দান্তটাও শেষকালে হাসিখুশী ভুলে গেল নাকি?

শ্রীমন্ত বললে, আচ্ছা চল্, শীগ্‌গির শীগ্‌গির বাড়ীই ফেরা যাক।
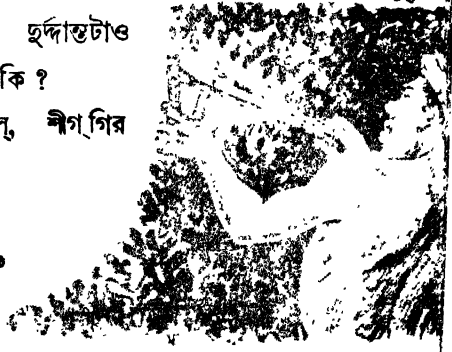
দুর্দান্তের

— ১ —

বাড়ীতে পৌঁছে ভাই-বোনে একেবারে হকচকিয়ে গেল।

একদল লোক এসে ভারী-ভারী আলমারি, আসবাবপত্র, খাট, টেবিল সব বের ক'রে গরুর গাড়ীতে বোঝাই করছে। বাবা বারান্দার এক কোণে ব'সে সব দেখছেন, কিন্তু ওদের কিছু বলছেননা। একটা টেবিলে শ্রীমন্ত একদিন পেরেক দিয়ে একটা আঁচড় কেটেছিল ব'লে বাবা কত বকুনি দিয়েছিলেন, আজ সেইসব জিনিসপত্র লোকগুলো যেভাবে টেনে হিঁচড়ে বের ক'রে নিয়ে যাচ্ছে তা চোখ মেলে দেখা যায়না।

বাবার মনে যে কী রকম লাগছে শ্রীমন্ত তা বেশ বুঝতে পারলে। সেইজন্যেই আজ সকাল থেকে বাবা অমন গুম্ হয়ে রয়েছেন, মুখে একটা কথা নেই! তাদের বাবা ত' এ-রকমটি ছিলেননা!

হসন্ত ফিস্‌ফিস্ ক'রে শুধোলে, আচ্ছা দাদা, সকাল থেকে আজ মাকে দেখছিনে···মা কোথায় গেল ?

শ্রীমন্ত বললে, চল্ যাই,—ঠাকুর ঘরটা একবার দেখে আসি, মা হয়তো চুপ্‌চাপ্ ঐখানেই ব'সে আছেন।

ওরা দু'জনে পা টিপে-টিপে বারান্দা ধ'রে লক্ষ্মীর ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। শ্রীমন্ত যা' ভেবেছিল ঠিক তাই।

দাস্যপণা

ওদের মাকে ওরা কখনো চোখের জল ফেলতে দেখেনি। সেই মা জানলার গরাদ ধ'রে দাঁড়িয়ে আছেন আর ক্রমাগত ছ'চোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছে।

ভাই-বোনকে দেখে মা কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিলেন। আঁচলে মুখটা মুছে বললেন, তোদের খাবার পাশের ঘরে ঢাকা আছে, খেয়ে নিয়ে মাঠে খেলা ক'রে আয়গে। বাড়ীতে গোলমাল চলছে, এখন আর এখানে থাকিসনে তোরা।

শ্রীমন্ত ভেবেছিল, কেন এই লোকগুলো এসে জিনিসপত্র টেনে নিয়ে যাচ্ছে, কেন তার বাবা ওদের কিচ্ছু বলছেননা— তাড়িয়ে দিচ্ছেননা সেইকথা মাকে জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু মায়ের থমথমে মুখের অবস্থা দেখে কিছু জিজ্ঞেস করবার সাহস সে তার মনের মধ্যে খুঁজে পেলেনা।

অনেক রাত্তিরে আবার শ্রীমন্তের ঘুম ভেঙে গেল।

বাবার সঙ্গে মার কথাবার্ত্তা চলছে।

বাবা বললেন, একটা চরম-কিছু হয়ে গেল বটে, কিন্তু আজ আমি ঋণমুক্ত। এইবার দশজনের মাঝখানে আমায় আর মাথা নীচু ক'রে দাঁড়াতে হবেনা। নিজেদের পেটের ব্যবস্থা অবশ্য একটা ক'রে নিতে পারবো। শুনলাম, কলকাতার বাজারে খুব মাছের দর উঠেছে। পুকুরটায় পোনা ছাড়বো···এছাড়া আরো একটা বিলের সন্ধানে আছি। সেটা যদি ইজারা নিয়ে পোনা ছাড়তে পারি ত' আমাদের খাওয়া-পরা

এক রকম ভালোভাবেই চ'লে যাবে। দুঃখু এই যে, ছেলেটাকে মানুষ ক'রে দাঁড় করিয়ে যেতে পারলামনা।

মা বললেন, হবে গো হবে। একদিনে অত ভাবতে গেলে কূল-কিনারা খুঁজে পাবেনা···ভগবান একটা হদিশ দেবেনই।

বাবা এইবার গলাটা খাটো ক'রে বললেন, দেখো, একটা কথা তোমায় বলবো। ছেলে-মেয়ে ঘুমিয়েছে ত'?

মা জবাব দিলেন, সেই সন্ধ্যেবেলায় ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে। আহা, বাছারা মুখ ফুটে কিছু বলতেও সাহস পায়না—কেন ওদের জিনিসপত্র সব নিয়ে যাচ্ছে, কেন আমরা কিছু বলছিনা। আমরা নাহয় বুঝে সব সহ্য করছি, কিন্তু ওদের মনের কষ্ট আরো বেশী।

বাবা বললেন, অমন ক'রে বোলোনা, আমি সইতে পারিনে।

মা খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বললেন, তুমি যে কী বলবে বললে? বাবা জবাব দিলেন, হ্যাঁ, শোনো। ধনগঞ্জের বাবুরা আমাদের দুর্দান্তকে দেখেছে। ওকে ওদের ভারী পছন্দ হয়েছে। একটা মোটা-টাকা দিয়ে তারা ওকে কিনে নিতে চায়। আমাদের দু'তিন মাসের খাওয়া-খরচ চ'লে যাবে এইরকম টাকা দিতে রাজী। আমি শুধু ভাবছিলাম, শ্রীমন্তের কথা। কুকুরটা ছেলেটার এমন ন্যাওটা হয়েছে যে—

বাবা মুখের কথাটা শেষ না করেই খানিকক্ষণ চুপ ক'রে

রইলেন। তারপর মাকে শুধোলেন, তুমি কোনো কথা কইছো না যে। বুঝেছি, তোমার মত নেই।

মা বললেন, আমার কথা যদি জিজ্ঞেস করো ত' বলবো—এক্ষুনি ওকে তুমি বিদেয় ক'রে দাও। কুকুরটাকে আমি যেন আর সইতে পারছিনে। যেদিন ও খুনে-ডাকাতের মতো পায়রাটার ঘাড় মট্‌কালে, সেই রাত্তিরেই ত' তুমি সর্ব্বনেশে খবর নিয়ে ফিরে এলে। আমি জানতাম—একটা অমঙ্গল এ-বাড়ীতে ঘটবেই।

বাবা জবাব দিলেন, ওটা তোমার মনের ভুল। উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপালে চলবে কেন? আমার নিজের বোঝবার দোষেই কারবার নষ্ট হয়েছে। দোষ ত' আর কুকুরের নয়।

মা বললেন, সব বুঝি, তবু যেন আমি ওর দিকে ভালো ক'রে তাকাতে পারছিনে। শুধু ছেলে-মেয়ের কথা ভেবে চুপ ক'রে আছি।

বাবা বোধকরি এইবার মনে একটু জোর পেলেন। বললেন, তাহ'লে আমি ধনগঞ্জের বাবুদের কথা দিয়ে দি?

মা যেন দুর্দ্দান্তের হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্য বললেন, হ্যাঁ, সেই ভালো। আর, তাছাড়া আমরা এখন রোজ-রোজ ওর মাংস আর দুধ জোগাবো কি ক'রে? বড়লোকের বাড়ী যাক, সেখানে থাকবে ভালো। ছেলে-মেয়ে নেহাৎ কান্না-কাটি করে, মাঝে-মাঝে গিয়ে তুমি দেখিয়ে নিয়ে এসো তা হলেই হবে।

বাবা পাশ ফিরে শুয়ে জবাব দিলেন,
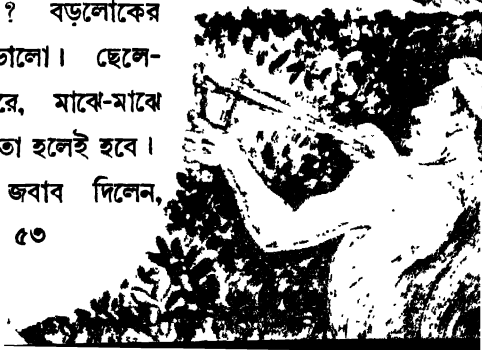
তাই হবে। এতগুলো টাকার মায়া ত' অমনি আজকের দিনে হুট্ ক'রে ছেড়ে দেওয়া যায়না।

এরপর বাবা-মার আর কোনো কথা শোনা গেলনা! হয়তো তাঁরা দু'জন ঘুমিয়েই পড়লেন।

কিন্তু ঘুম নেই আজ শ্রীমন্তের দুটি চোখে! দুর্দ্দান্তকে বাবা বিক্রি ক'রে দেবেন? তাহ'লে ত' দুর্দ্দান্ত মরেই যাবে। ও নিজে যে কিভাবে থাকবে সেকথা আজ ভাবতেই পারলেনা।

তারপর পাশে হাত দিয়ে দেখলে, দুর্দ্দান্ত নেই।

কোথায় গেল আবার ও? পরম আশঙ্কায় শ্রীমন্ত উঠে বসলো। নাঃ, দুর্দ্দান্ত তার পায়ের কাছে শুয়ে নিশ্চিন্ত-আরামে ঘুমিয়ে রয়েছে।

শ্রীমন্তর মাথায় কল্পনা কিল্‌বিল্ করতে লাগলো। কি করতে পারে সে এখন? দুর্দ্দান্তকে নিয়ে এ-বাড়ী ছেড়ে ও ত' পালিয়ে যেতে পারে! কিন্তু পালিয়ে কোথায় গিয়ে থাকবে সেকথা ত' একবারও মনে আসছেনা!

কিন্তু এ-কথাও ত' কোনোমতে ভুললে চলবেনা যে, দুর্দ্দান্ত একান্তভাবে তাকে আশ্রয় করেই রয়েছে। দুর্দ্দান্ত ঠিক জানে যে, আর কেউ ওকে ভালো না বাসলেও শ্রীমন্ত তাকে বুকে আঁকড়ে ধ'রে থাকবে।

আর, তাছাড়া অন্যের কাছে গিয়ে দুর্দ্দান্ত দু'দণ্ড ঠিক থাকতে—দুদিন বেঁচে থাকতে পারবে কিনা সন্দেহ। তারা কি

জানে দুর্দ্দান্ত কি ভালোবাসে, কখন খেলতে চায়, কি খেতে চায় ? কোথা শুয়ে থাকলে সে আরামে ঘুমুতে পারে ?

না-না, তা কী ক'রে সম্ভব ? দুর্দ্দান্তকে কোনোমতেই ছাড়া চলবেনা। ওরা ভাই-বোনে যা খাবে, দুর্দ্দান্তও তাই খেয়ে ওদের সঙ্গে হেসে-খেলে ওদের মধ্যে বেঁচে থাকবে।

একবার ভাবলে, বাবাকে সব কথা খুলে বলি। কিন্তু একটা অব্যক্ত অভিমানের ব্যথা ওর বুক থেকে ঠেলে-ঠেলে উঠতে লাগলো। সে বুঝতে পারলে, বাবাকে কিছুই বলা হবেনা ; হয়তো বেশী কিছু বুঝিয়ে বলতে গেলে সে কেঁদেই ফেলবে। সে একটা বিষম লজ্জার কথা হবে।

পরদিন সকালবেলা ওর উঠতে খুব দেরী হ'ল। মা আজ ডেকে কথা বললেন। কইলেন, রোজ-রোজ দেরী ক'রে উঠছিস কেন বল্‌তো ? শরীর খারাপ হয়নি ত' ? তিনি কপালে আর বুকে হাত দিয়ে দেখলেন। শ্রীমন্ত জবাব দিলে, কিছু হয়নি মা, শরীর আমার বেশ ভালোই আছে।

মনে-মনে ভাবলে, আমার মা যেমন আমায় আদর ক'রে কাছে ডাকলেন, গায়ে, কপালে হাত দিয়ে দেখলেন—আজ দুর্দ্দান্তের মা থাকলে সেও ত' তার ছেলেকে এমনি ক'রে কাছে টেনে নিতো, অসুখ করলে ভেবে অস্থির হ'ত। আজ ওর দিকে তাকাবার কেউ নেই বলেই বাবা ওকে বিক্রি ক'রে দিচ্ছেন। বাবা গরীব হয়ে পড়েছেন ব'লে কি
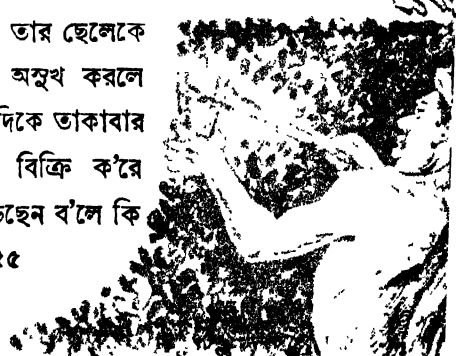
আমায়ও একদিন বিক্রি ক'রে দিতে পারেন? ওর ছোট-মনে আজ যেন তুফান উঠেছে! এইসব কথা ভাবতে-ভাবতে ওর দুটি চোখ জলে ভ'রে এলো! সেদিন ও না খেয়েই স্কুলে চ'লে গেল।

মা গিয়ে বাবাকে বললেন, হ্যাঁগা, শ্রীমন্ত কিছু জানতে পেরেছে নাকি? নইলে ও আজ আমায় কিচ্ছু না ব'লে, না খেয়ে ইস্কুলে গেল কেন? এমন ত' কখনো হয়না।

বাবা প্রথমটা একটু অপরাধীর মতো চুপ ক'রে রইলেন, তারপর বললেন, না-না, তাহ'লে আর দেরী করা ঠিক হবেনা, আমি আজই ধনগঞ্জে খবর দিচ্ছি। ছেলে-পুলের মন, কখন কি হয় বলা যায়না।

একটুখানি পরে তিনি মাকে শুধোলেন, আচ্ছা, ও জানলে কি ক'রে আমায় বলতে পারো? আমরা যখন এ-ব্যাপারে কথা-বার্ত্তা বলেছি তখন ত' গভীর রাত।

মা বললেন, বলা শক্ত, হয়তো তখন ও জেগে উঠেছিল, কিম্বা আমাদের মুখের চেহারা দেখে ওরা কিছু সন্দেহ করছে।

বাবা আশ্চর্য্য হয়ে শুধোলেন, তুমি বলো কি? আমাদের মুখের চেহারা এই এক রাত্তিরের ভেতরই কি অপরাধীর মতো হয়ে উঠেছে নাকি? আশ্চর্য্য!

মা একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে জবাব দিলেন, বিশ্বাস নাহয় আয়না এনে নিজের মুখটা একবার দেখোনা।

বাবা ভয়ে-ভয়ে বললেন; সে সাহস আজ আমার নেই।

দস্যিপণা

— ১ —

ধনগঞ্জের বাবুদের সেইদিনই খবর পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল।

শ্রীমন্তের বাবা ভেবেছিলেন, তিনি নিজে গিয়েই খবর দিয়ে আসবেন। কিন্তু এইরকম মনের অবস্থায় মা তাকে কিছুতেই একা-একা ছেড়ে দিতে রাজী হলেননা, সুতরাং চিঠিতেই তাদের সম্মতি জানিয়ে দেওয়া হ'ল।

দু'দিন ধ'রে বাপ আর ছেলেতে যেন লুকোচুরি খেলা চলছে। বাপ জানেন, ছেলে তাঁর অভিসন্ধির কথা সব জেনে ফেলেছে আর ছেলে বুঝেছে যে, যে-কোনো মুহূর্ত্তে দুর্দ্দান্ত তার হাত-ছাড়া হ'য়ে যেতে পারে। মাঝখানে প'ড়ে দুর্দ্দান্তই কিছু বুঝতে পারছেনা। অথচ শ্রীমন্তের রকম-সকম দেখে সে অবাক হয়ে ফ্যাল্-ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে থাকে। দু'দিন থেকে শ্রীমন্তের আদরও যেন হঠাৎ বেড়ে গেছে। এর হদিশ দুর্দ্দান্ত কোনোমতেই পায়না।

বাড়ীর এই থমথমে ভাবটা সব-চাইতে উতলা ক'রে তুলেছে, হসন্তকে। সে ভেবেছিল, দাদার কাছেই সব-কিছু খবর জানা যাবে, কিন্তু দিন-কে-দিন সেও যেন একটা প্রকাণ্ড হেঁয়ালি হয়ে উঠছে।

হাসি-খুশী-ভরা মেয়ে হসন্ত কোনো-কিছুরই যেন হদিশ পায়না। একটি ছোট্ট জুঁইফুল যেমন ক'রে প্রখর সূর্য্যের কিরণে

ঝ'রে প'ড়ে, হসন্ত তেমনি ধীরে-ধীরে শুকিয়ে যেতে লাগলো। ওর দিকে তাকাবার আজ কেউ নেই।

চারদিনের দিন ধনগঞ্জের বাবুদের গোমস্তা এসে হাজির। শ্রীমন্তের বাবা তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, কিছু মনে করবেননা গোমস্তামশাই, ছেলেটা এখনো ইস্কুলে যায়নি কিনা···ও যদি এখন জানতে পারে তবে কেঁদে-কেটে অনর্থ করবে। আপনি বরঞ্চ একটু ঘুরে-টুরে—মানে বাজারটা বেড়িয়ে আসুন।

গোমস্তামশাই পাকা ঝানু লোক। বললে, সে ত' সত্যি কথাই। আচ্ছা, আমি ঘণ্টাখানেক বেড়িয়েই আসছি। জায়গাটাও দেখা হবে'খন—হেঁ-হেঁ-হেঁ!···আমার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাটা—

শ্রীমন্তের বাবা ব্যস্ত হয়ে বললেন, সে কি কথা! আপনি আজ আমার অতিথি। ফিরে এসে স্নান-খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে ওটাকে নিয়ে যাবেন। ভালো কথা, টাকাটা এনেছেন ত'?

গোমস্তামশাই মৃদু হেসে জবাব দিলেন, আজ্ঞে, ধনগঞ্জের বাবুদের গোমস্তা কি কখনো কাঁচা কাজ করে? সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন—একেবারে যাকে বলে, ডান-হাত বাঁ-হাত—বুঝলেন না?···হেঁ-হেঁ-হেঁ।

লাঠি ঠক্-ঠক্ করতে-করতে গোমস্তামশাই বেরিয়ে গেলেন।

শ্রীমন্ত কিন্তু এর বিন্দু-বিসর্গও জানতে পারলেনা। ওর মনে

দস্যিপণা

একটা কালো মেঘ ধীরে-ধীরে জমে উঠছিল বটে, কিন্তু কখন যে বর্ষণ হবে সেটা ত' আর সে নিজে জানেনা। তবে একটা আশঙ্কার ছায়া প্রত্যহ সে ঘুমের মধ্যে…স্বপ্নের ভেতরও অনুভব করে।

সেদিনও দুর্দ্দান্ত ভাই-বোনের বই-পত্তরের থলি মুখে নিয়ে ইস্কুলের দিকে রওনা হ'ল। গাছতলা পর্য্যন্ত ওর যাবার সীমানা, ইতিমধ্যে দুর্দ্দান্ত সেটা বেশ ভালো ক'রে বুঝে নিয়েছে।

ওর মুখ থেকে বইয়ের থলি নেবার সময় শ্রীমন্ত বললে, দেখ দুর্দ্দান্ত, আসবার সময় দেখলাম, রাস্তার ধারে একটি গাছে চমৎকার সব পেয়ারা পেকে রয়েছে। যাবার মুখে নিতে হবে কিন্তু।

উৎসাহ জানিয়ে দুর্দ্দান্ত ল্যাজ নাড়তে লাগলো।

হসন্ত এই নতুন পরিকল্পনায় খুশী হয়ে উঠলো। নইলে মুখ-গোম্‌রা ক'রে লোকে আর কতদিন বাঁচে? বললে, আমায় গোটা-কয়েক ভালো-ভালো পেয়ারা দিতে হবে কিন্তু।

শ্রীমন্ত বললে, দূর! তোকে কেন দেবো? তুই কি গাছে চড়তে পারবি? আমি গাছে উঠে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে দেবো আর দুর্দ্দান্তটা লুফে-লুফে নেবে…জঙ্গলে পড়লে কুড়িয়ে আনবে কি বলিস রে দুর্দ্দান্ত?

হসন্ত কোঁকড়া চুল দুলিয়ে জবাব দিলে, আমিও কুড়িয়ে আনবো, যেগুলো আমার হাতে পড়বে সেগুলো কিন্তু আমার। সে লাফাতে-লাফাতে ইস্কুল-ঘরের দিকে চ'লে গেল।

দুর্দ্দান্ত এক-ছুটে চ'লে এলো বাড়ী।

ঢুর্দ্দান্তের

ততক্ষণে গোমস্তামশাই বেড়ানো শেষ ক'রে বাসায় ফিরে দিব্যি গুড়ুক-গুড়ুক তামাক টানছেন। ঢুর্দ্দান্তকে দেখে বললেন, চমৎকার কুকুর ত' আপনার! ধনগঞ্জের বাবুদের মন ভুলিয়েছে, এ কি ভালো না হয়ে যায়? বাজারের সব খাসা জিনিস না হ'লে বাবুদের

মন ওঠেনা, আর তাই জোগাড় করতে এই শর্ম্মার প্রাণান্ত আর কি—হেঁ-হেঁ-হেঁ! গোমস্তামশায়ের রসিকতা শ্রীমন্তের বাবার একটুও ভালো লাগছিলনা। তিনি শুধু বললেন, আপনি তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে কুকুরটাকে নিয়ে রওনা হয়ে পড়ুন। এরপর বেলা বেড়ে গেলে রোদও খুব চড়া হয়ে উঠবে, তখন সত্যি আপনার কষ্ট হবে। খানিকটা পথ ত' আপনাকে হেঁটে যেতেই হবে···তারপর পাবেন নৌকো।

গোমস্তামশাই বললেন, সেই ভালো।

খাওয়া-দাওয়ার শেষে লেন-দেনের কাজটাও সমাধা হয়ে গেল।

এইবার ঢুর্দ্দান্তের অবাক হবার পালা।

ঘরের বারান্দায় ব'সে ছু'জনে কি ফিস্‌ফাস্ কথা বলছে দেখেই ঢুর্দ্দান্তের কেমন যেন সন্দেহ হ'ল।

গোমস্তার হাসিটা কিন্তু ওর আদপেই ভালো লাগছিলনা। কেবল হেঁ-হেঁ ক'রে হাসে আর চশমার ফাঁক দিয়ে আড়-চোখে ওর পানে তাকায়। নিশ্চয়ই ওর কোনো কু-মতলব আছে। লোকটা বিদেয় হ'লে যেন বাঁচা যায়। কিন্তু নড়বার কি কোনো লক্ষণ সে দেখাচ্ছে? খালি গুড়ুক-গুড়ুক তামাক টানছে আর তামাকই

টাণছে। ধোঁয়া ছড়িয়ে গোটা বারান্দাটা প্রায় অন্ধকার ক'রে ফেললে। শ্রীমন্তের বাবা বললেন, দেখুন, এইবেলা আপনি রওনা হয়ে পড়ুন, নইলে আর-খানিক-বাদে ইস্কুলের টিফিন হবে—কি জানি কিছু ত' বলা যায়না…

গোমস্তামশাই হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তাহ'লে আর দেরী করবোনা আমি। এই দেখুন, কর্ত্তাদের ফরমাজ মতো বগ্‌লস্ আর চেন কিনে এনেছি আমি। দিন ত' ওর গলায় আপনি পরিয়ে।

শ্রীমন্তের বগ্‌লস্ আর চেন খুলে রেখে শ্রীমন্তের বাবা—গঞ্জের বাবুদের নতুন শেকল পরিয়ে দিলে দুর্দ্দান্তের গলায়। কত কথা দুর্দ্দান্তের বুক ঠেলে আসছিল। কিন্তু পশুর ভাষা কি মানুষে বুঝতে পারে? তাই সে বুঝি একেবারে বোবা হয়ে গেছে! ওর দুটো চোখ জলে ভ'রে এলো কিনা তাই-বা কে অনুরাগের দৃষ্টি নিয়ে দেখতে যাবে? সে নিতান্ত অসহায়ের মতো গোমস্তামশায়ের পেছনে-পেছনে চললো। সামান্য একটা মূক পশুর চোখের জলে মানুষের চলার পথ পিছল হয়ে উঠলো কি না সে খোঁজ নেবার সময় কর্ম্মব্যস্ত জগতের আছে কি?

গোমস্তামশাই ধনগঞ্জের জমিদারবাড়ীতে গিয়ে পৌঁছুতেই অন্দর এবং বার-মহলে একটা যেন জাগরণের সাড়া প'ড়ে গেল। ছেলের দলের দাবি সকলের আগে; আবার তাদের ভেতর ওকে কে আগে কোলে নেবে তাই নিয়ে রীতিমত প্রতিযোগিতা সুরু হয়ে গেল। সেই প্রতিযোগিতায় জিতলে কিন্তু ছোট্ট মেয়ে—মীনু।

দুর্দ্দান্তের
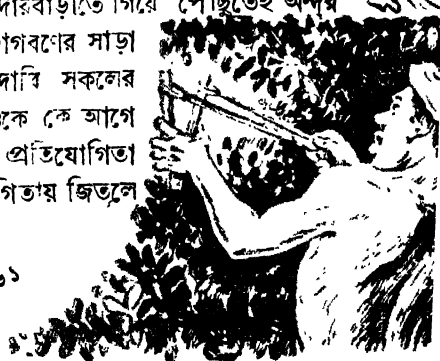
মীনু খোদ বড়বাবুর একমাত্র নাতনী। কাজেই দলের ভেতর অনেকের চাইতে ছোট হলেও তার দাবীই আগে। সে এগিয়ে এসে বললে, দাদু, এটাকে আমি আমার পুতুল-ঘরে রেখে দেবো।

কর্ত্তা হো-হো ক'রে হেসেই জবাব দিলেন, তুই নিজেই ত' একটা পুতুল রে মীনু, তোর আবার পুতুল-ঘর কিরে ?

মীনু গাল ফুলিয়ে বললে, তা বইকি! আমার বুঝি আর পুতুল নেই ?...গালফুলো গোবিন্দর মা, লড়াইয়ে-সিপাই, ব্যাংএর মাসী, দুষ্টু ষাঁড়, দেখন-হাসি...কত পুতুল আমি তার ভেতর সাজিয়ে রেখেছি—একদিন তোমায় দেখাবো'খন।

কর্ত্তা বললেন, কিন্তু একটা মুস্কিল আছে যে মীনু-গিন্নি; পুতুলরা খেতে চায়না, কিন্তু কুকুরের ত' ক্ষিদে পাবে দিনের মধ্যে অনেকবার। তার ব্যবস্থা কি করবে, শুনি ?

—খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা নেই বুঝি ? মীনু ঠোঁট উল্টে জবাব দেয়...কাদার পায়েস, পাতার লুচি, কাঁচভাঙা-পাঁপড়ভাজা, উই-মাটির বোঁদে...আরো কত কী আয়োজন ক'রে রেখেছি।

কর্ত্তা বললেন, কিন্তু তোমার সংসারের এই 'খানা' খেলে যে কুকুর একদিনেই পটল তুলবে।

তারপর কিন্তু ধনগঞ্জের জমিদার-বাড়ীর গোটা পরিবারের লোক হিমসিম খেয়ে গেল দুর্দ্দান্তকে কিছু খাওয়াতে। একবাটি দুধ দেওয়া হ'ল, সে ফিরেও তাকালেনা। রুটি, বিস্কুট, লজেন্স, চকোলেট, সব-কিছু সে শুঁকে চ'লে গেল—এতটুকু ভ্রূক্ষেপও করলেনা।

— ১৮ —

শ্রীমন্ত আর হসন্তর চারটে বাজবার যেটুকু অপেক্ষা; ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে চারটে আওয়াজ হ'তেই বই-পত্তর নিয়ে দে-ছুট্। আজ টিফিনের সময়ও দুর্দ্দান্ত খাবার নিয়ে আসেনি। বাড়ীর যে অবস্থা, আবার কি হ'ল কে জানে! হয়তো মা খাবার পাঠাতেই ভুলে গেছেন। কিন্তু দুর্দ্দান্তের কি উচিত ছিলনা একবার এসে তাদের ঘুরে দেখে যাওয়া!

ছুটতে-ছুটতে ভাই-বোন এসে সেই গাছটির তলায় হাজির হ'ল। নাঃ, দুর্দ্দান্তের চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই। বই-পত্তর নিয়ে দু'জনে রাস্তা ধ'রে ছুটে চললো। দুর্দ্দান্তের রওনা হ'তে যদি একটু দেরী হয়ে থাকে—রাস্তার মাঝখানে তাহ'লে দেখা হ'বেই। ভারী জব্দ হবে দুর্দ্দান্ত। দুর্দ্দান্তের হাজিরা-খাতায় লাল কালী দিয়ে আজ 'লেট্' কথাটা স্পষ্ট অক্ষরে লেখা হয়ে থাকবে। কিন্তু, কে জানে, দুর্দ্দান্ত হয়তো আজ তার সব-হিসেবের খাতা হারিয়ে দেউলে হয়ে ব'সে আছে···শ্রীমন্ত আর হসন্ত কি সে খাতা খুঁজে বের করতে পারবে?

বাড়ীতে ফিরে ওরা দু'জনে দেখে সব নিঝুম······কারো সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছেনা। তবে কি হঠাৎ মা কিম্বা বাবার অসুখ করলো? দুর্দ্দান্ত বাবার হাতের চিঠি নিয়ে ডাক্তারবাড়ী ছুটেছে?

দুর্দ্দান্তের

কিন্তু ঘরে ঢুকেই শ্রীমন্তের সমস্ত কল্পনার জাল ছিঁড়ে গেল। ঘরের এক কোণে প'ড়ে রয়েছে দুর্দ্দান্তের বগ্‌লস্‌ আর চেন। সেটার সঙ্গে যে শ্রীমন্তের কত ঘনিষ্ঠ পরিচয় সেকথা আর নতুন ক'রে বলবার প্রয়োজন করেনা।

তাহ'লে বাবা সত্যিই দুর্দ্দান্তকে পরের হাতে সঁপে দিলেন? একদিন বাবাই এই দুর্দ্দান্তকে তার হাতে পৌঁছে দিয়ে অপরূপ নামকরণ করেছিলেন, 'দুর্দ্দান্ত'। এই দুর্দ্দান্তকে ঘিরে শ্রীমন্ত আর হসন্তের যে স্বপ্নের মায়াপুরী গ'ড়ে উঠেছিল, আজ এক মুহূর্ত্তে কাল-বৈশাখীর ঝড়ের ঝাপটে তা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

শ্রীমন্ত আর কোনো কথাটি বললেনা···ধীরে-ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে পুকুরের পাড়ে গিয়ে বসলো। একবার ভাবলে, মাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, কেন তোমরা আমার এই খেলাঘর ভেঙে দিলে? কিন্তু শুধু প্রশ্ন ক'রে কি ফল হবে। সে আজ তার হাত-ছাড়া হয়ে গেছে। কত দূরে রয়েছে তা কে বলতে পারে?

ছেলে-মহলে সে শুনেছিল যে, একজাতীয় জ্যোতিষী আছে—যারা নখের দিকে তাকিয়ে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান সব-কিছু ব'লে দিতে পারে। বুড়োআঙুলের নখের ভেতর তারই মূর্ত্তি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—যাকে সে দেখতে চায়। এইরকম কোনো জ্যোতিষীর সন্ধান যদি সে জানতো ত' এক্ষুনি ছুটে যেতো তার কাছে। ক্ষিদেয় তার নাড়ি জ্বলছে, কিন্তু কিছু মুখে দেবার মতো ইচ্ছে তার নেই।

ঠিক এইসময় ধনগঞ্জের জমিদার-বাড়ীতে ছেলের দল দুর্দ্দান্তের সামনে এনে হাজির করলে এক-প্লেট মাংস। দুর্দ্দান্ত একটিবার শুধু শুঁকে দেখলে। বুঝলে, এতে চেনা-লোকের হাতের স্পর্শ নেই, তাই আবার গিয়ে নিজের জায়গায় চুপ-চাপ ব'সে রইলো।

মীনুর কি আর ফুরসৎ আছে ?

দুর্দ্দান্তকে নিয়ে তার এক নতুন খেলাঘর তৈরী হ'ল। সে কিসের ওপর রাত্তিরে শোবে তাই নিয়ে মেয়ের এক মহা ভাবনা।

দাদু বললেন, তোর সেই নানান রকম ফুলের কাজ-করা কাঁথাটা এনে ওকে পেতে দে না। মীনু বললে, সেই ভালো দাদু।

কাঁথায় শুয়েও দুর্দ্দান্তের কিন্তু এক মুহূর্ত্ত স্বস্তি নেই।

মানুষরা যাকে বলে, শয্যা-কণ্টক···তাই হয়েছে ওর। একবার উঠছে, একবার বসছে···বগ্‌লস্‌টা যেন কাঁটার মতো বিঁধছে ওর গলায়। সারাটা রাত সে আদপেই ঘুমুতে পারলেনা।

সকালবেলা মীনু এসে খবর দিলে, দাদু, রাত্তিরে দুর্দ্দান্তকে যে খাবার দেওয়া হয়েছিল তা ও ছুঁয়েও দেখেনি। এমনি ক'রে ও বাঁচবে কি ক'রে বলো ত' ?

দাদু বললেন, নতুন জায়গা, নতুন মানুষ···তাই হয়তো ভালো লাগছেনা। দু'দিন পরেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিছুক্ষণ পরে মীনু সাবান আর গরম জল নিয়ে বসলো ওকে পরিষ্কার করতে। দুর্দ্দান্তও দুষ্টু কম নয়। এমন জোরে ভোক্-ভোক্-ভোক্ ক'রে ডেকে উঠলো যে, মীনু সাবান, তোয়ালে, গরম জল ফেলে পালাবার পথ পায়না।

দুর্দান্তের

দুপুরবেলা ছেলেপুলেরা সব ইস্কুলে চ'লে গেল। এইসময় দুর্দান্তের একটু নিশ্চিন্তি। কেউ আর আদর দেখিয়ে তাকে অস্থির ক'রে তুলতে পারবেনা।

ক্রমে সূর্য্য ঢ'লে পড়লো পূব থেকে পশ্চিমে আর গাছের ছায়া মোড় ফিরলো পশ্চিম থেকে পূবে। দুর্দান্তের সময় আর কাটিতে চায়না। দাদু দিবা-নিদ্রা দিচ্ছেন… রাখাল-ছেলেটা বাইরের উঠোনে ব'সে এই অবসরে প্রাণপণে তামাক টেনে নিচ্ছে…ঝিয়ের দল এঁটো বাসন নিয়ে ঘাটে চললো…সব নির্লিপ্তভাবে দুর্দান্ত দেখে চলেছে। মন কিন্তু বসছেনা কিছুতেই।

হঠাৎ ঢং ঢং ক'রে ঘড়িতে চারটে বাজলো। দুর্দান্ত কান খাড়া ক'রে উঠে দাঁড়ালো। এই ত' সময়! ইস্কুল থেকে শ্রীমন্ত আর হসন্ত ছুটে আসছে বাইরে…হাতে তাদের বই-খাতা-পত্তরের ঝোলা।…সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, ওরা দুটিতে খালি বটগাছের তলায় ঘন-ঘন তাকাচ্ছে। ওদের চোখের কোণে কি জল?…দুর্দান্ত আর স্থির থাকতে পাবলেনা।

ওর গায়ে যেন আজ অসুরের শক্তি। এক ঝট্‌কা মেরে চেনটা ছিঁড়ে ফেলে বিদ্যুৎগতিতে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

উঠোনের রাখাল-ছেলেটা হাঁ-হাঁ ক'রে চেঁচিয়ে লাফিয়ে উঠলো… ওর কল্‌কের আগুন সারা গায়ে ছড়িয়ে পড়লো। চীৎকার শুনে দাদুর ঘুম গেল ভেঙে…তিনি হুকুম দিলেন, ওরে, কে আছিস্, শীগ্‌গির ধর ওটাকে…

দুর্দান্ত ততক্ষণে বিদ্যুৎগতিতে যেন ধূমকেতুর মত উড়ে চলেছে…

— ১১ —

শ্রীমন্তের বাবার ঘুম তখনো ভাঙেনি।

বাইরের দরজায় খট্‌খট্‌ শব্দ শুনে তিনি উঠে বসলেন। এত-সকালে আবার কে এলো? নতুন কোনো পাওনাদার কি?

কথায় বলে, ঘর-পোড়া গরু সিঁদুরে-মেঘ দেখলে ভয় পায়।

আস্তে-আস্তে গিয়ে তিনি সদর দরজার হুড়কো খুলে দিলেন। কিন্তু, একি? এ যে ধনগঞ্জের বাবুদের গোমস্তামশাই। চশমার ফাঁক দিয়ে ঘন-ঘন তাঁর দিকেই তাকাচ্ছেন। কিন্তু উনি কিছু পাবেন ব'লে ত' মনে হয়না। হয়তো কুকুর-বিক্রির কমিশনটা আদায় করতে এসেছেন।

গোমস্তামশাই কিন্তু কোনোরকম ভূমিকা না করেই সোজা-বাঙলায় বললেন, মশাই, কুকুরটা বের ক'রে দিন ত'। হয়রাণীর একশেষ আর-কি।

—কুকুর!

ভদ্রলোক একেবারে যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন, আপনি বলছেন কি গোমস্তামশাই? কুকুর ত' আপনিই সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলেন।

গোমস্তামশাই জবাব দিলেন, তা গেলাম বটে, কিন্তু কুকুরটাকে এমন ক'রে তৈরী করেছেন যে, একেবারে চেন ছিঁড়ে পালিয়ে
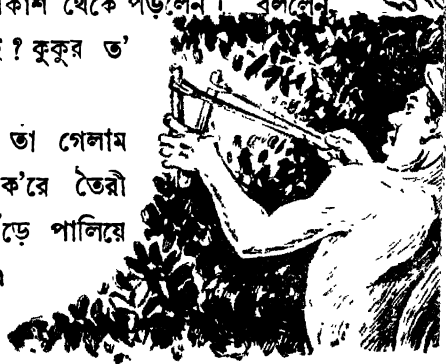
দুর্দ্দান্তের

গেল। এ যে সেই সন্ন্যাসীর পাঁটার মাংস খাওয়া হ'ল।…'বান্ধবী' ব'লে নাম ধ'রে ডাকতেই সন্ন্যাসীর ভূঁড়ি ফুঁটো ক'রে আস্তো পাঁটা বেরিয়ে এলো। আচ্ছা মতলব করেছেন মশাই, টাকাটা ত' উপরি পাওনা…

গোমস্তামশায়ের কাছ থেকে দুর্দ্দান্তের পলায়নের সমস্ত খবর শুনে শ্রীমন্তের বাবা একেবারে গুম্ হয়ে রইলেন। তারপর বললেন, বিশ্বাস করুন, কুকুরটা আমার এখানে ফিরে আসেনি।

গোমস্তামশাই চ'টে উঠে জবাব দিলেন, তাহ'লে নিশ্চয়ই আপনার সেই গুণধর পুত্রটি তাকে লুকিয়ে রেখেছে। ডাকুন তাকে। শ্রীমন্ত দরজার পাশেই লুকিয়ে কথা কাটা-কাটি শুনছিল। এইবার সামনা-সামনি বেরিয়ে এসে বললে, দেখুন, মিথ্যেকথা বলা আমাদের অভ্যেস নেই। দুর্দ্দান্ত যদি আমার কাছে ফিরে আসতো ত' আমি সত্যিকথাই বলতাম—বাবার মুখ কখনো নীচু হ'তে দিতামনা।

শ্রীমন্তের কথা বলবার ধরন দেখে গোমস্তামশাই বুঝতে পারলেন, সে যা বলছে তাতে মিথ্যার লেশমাত্র নেই।

আপন মনে বিড়-বিড় ক'রে বললেন, খাচ্ছিলো তাঁতি তাঁত বুনে…এই কুকুরই দেখছি আমার চাকরি খাবে আচ্ছা, বলতে পারেন কোথায় গেল সেই দুর্দ্দান্তটা ?

—১২—

দুর্দ্দান্ত সেইসময় একটা মাঠের পাশ দিয়ে মরণ-পণ ক'রে ছুটে চলেছিল। সামনে অনেকটা জমি নিয়ে বাঁশের ঘর তৈরী করা হয়েছে। এইখানে একদল আমেরিকান-সৈনিক ছাউনী ফেলেছে। হঠাৎ একটি সৈনিক বেরিয়ে এসে কুকুরটাকে দেখেই আনন্দের আতিশয্যে শীষ দিয়ে ডাকলে। ওর পকেটে ছিল খানকয়েক বিস্কুট, তারি দু'খানা সে দুর্দ্দান্তের সামনে ছুঁড়ে দিলে।

ক্ষিদেয় দুর্দ্দান্তের পেট তখন জ্বলে যাচ্ছিলো। তিন-চারদিন সে একেবারে কিছু খায়নি···শুধু মরিয়া হয়ে ছুটেছে। ভাবলে, মন্দ কি। ধরা না দিলেই হ'ল। দু'খানা বিস্কুট খেয়ে আবার লম্বা ছুট্ দেবে। কিন্তু বিস্কুট খাবার জন্যে যেই সে এগিয়ে গিয়ে মাথা নীচু করেছে—আমেরিকান-সৈনিকটি ছুটে এসে তার ছেঁড়া-চেনটা ধ'রে ফেললে, তারপর কোলে তুলে নিয়ে সৈন্য-শিবিরের মধ্যে ঢুকে গেল। ওকে পেয়ে সৈন্যদলের সে কী উল্লাস।

যে সৈনিকটি দুর্দ্দান্তকে ধরেছিল সে হ'চ্ছে একজন বৈমানিক, তক্ষুনি তাকে বিমানে চেপে আসামের দিকে রওনা হ'তে হবে। যাওয়ার ঠিক পূর্ব্বমুহূর্ত্তে এমন সুন্দর একটি কুকুর পেয়ে তার উল্লাস দেখে কে! সৈন্য-শিবিরেই একটি ভালো রর চেন পাওয়া গেল। আর-একটি

দুর্দ্দান্তের

সৈনিকের সখের কুকুর আমেরিকা থেকে বিমানযোগে আসবার পথে মারা যায়। সুতরাং সেই চেনটি এখন দুর্দ্দান্তের কণ্ঠ অলঙ্কৃত ক'রে বসলো।

বৈমানিক তাকে সঙ্গে ক'রে বিমানে চেপে বসলো। হু-হু ক'রে সেই বিমান আকাশপথে উড়ে চললো।

নীচের দিকে তাকিয়ে দুর্দ্দান্ত ভাবতে লাগলো, এত ছোট-ছোট বাড়ী-ঘর, দালান-কোঠা দেখা যাচ্ছে—ঠিক যেন পুতুলের খেলনা! এর মধ্যে শ্রীমন্তের বাড়ী কোনটি?

বিমান কিন্তু ততক্ষণে আসামের দিকে মোড় ফিরেছে!

সেইদিনই ওরা গিয়ে আসামের জঙ্গলে হাজির হ'ল। সেখানকার সৈনিকদল ওকে দেখে হাতের মুঠোয় যেন পূর্ণিমার চাঁদ খুঁজে পেলে। যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়া যেটুকু সময় থাকতো, সৈনিকেরা সবাই মিলে ওকে নিয়েই একেবারে মেতে থাকতো। খানা-পিনার কোনো অভাব নেই…মাংস, রুটি, চকোলেট, বিস্কুট… যা খুশি খাও আর সকলের কাঁধে চ'ড়ে-চ'ড়ে ঘুরে বেড়াও।

একদিন হ'ল কি…সৈনিকটি ওকে চান করাবার জন্যে একটা পাহাড়ী-ঝরণার কাছে হাজির হ'ল। দুর্দ্দান্ত দম বন্ধ ক'রে সুযোগের প্রতীক্ষা করতে লাগলো। যেই চেনটা খুলে ওকে কোলে তুলে সৈনিকটি ঝরণার কাছে এগিয়ে গেছে, অমনি দুর্দ্দান্ত এক লাফে মাটিতে পড়েই একেবারে দে-ছুট!

পাশেই আর-একটি সৈনিক দাঁড়িয়েছিল। তার হাতে ছিল, বন্দুক। সে সঙ্গে-সঙ্গে বন্দুকটি তুলে ওর একটা পায়ে গুলি ছুঁড়তে গেছে, কিন্তু এই সৈনিকটি তাকে থামিয়ে দিলে। বললে, থাক্‌গে···হাজার হোক একটা মায়া ব'সে গেছে। ওকে আর গুলি করিসনি। আসবার হ'লে ও আপনিই আবার ফিরে আসবে। ঘরের পোষা-কুকুর ত'···এই আসামের জঙ্গলে আর কত দূর যাবে? বুনো জন্তু-জানোয়ারেরও ত' ভয় আছে!

দুর্দ্দান্ত কিন্তু ফিরে আসবার মতলব ক'রে ছুটে চলেনি। অবিশ্রান্তভাবে সে শুধু এগিয়ে চলেছে। ইতিমধ্যে সে আরো একটি পাহাড়ী-ঝরণা পার হয়ে এসেছে। কিন্তু সামনে আঁধার নেমে আসছে। বুনো জন্তু-জানোয়ারের গন্ধও আশে-পাশে ঝোপে-ঝাড়ে সে পাচ্ছে। কাজেই এখন থেকে খুব সাবধানে এগুতে হবে। কিন্তু রাত কাটাবার জন্যে একটি ডেরা জোগাড় না করলেই নয়। হঠাৎ পেছন থেকে একটি নেকড়ে বাঘ দুর্দ্দান্তের পিঠের ওপর লাফিয়ে পড়লো। দুর্দ্দান্ত চেষ্টা করলে এক ঝটকায় তাকে ফেলে দিতো, কিন্তু কিছুতেই যখন সেটা সম্ভবপর হ'লনা—তখন সে মাটিতে প'ড়ে গড়াতে সুরু করলে। নেকড়েটা এমন জোরে তার ঘাড়টা কামড়ে ধরেছে যে, তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া এক রকম অসম্ভব বলেই মনে হ'ল। দরদরধারে রক্ত বেরুতে লাগলো, দুর্দ্দান্তের মনে হ'ল, এই তার জীবনের শেষ সময়। সে একটা বুকফাটা আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলো।

দুর্দান্তের

কুকুরের এই চীৎকার শুনে দু'টি আসামী লোক লাঠি-সোটা নিয়ে ছুটে এলো এবং নেকড়েটাকে মারতে-মারতে আধমরা ক'রে ছেড়ে দিলে। দুর্দান্ত একেবারে নেতিয়ে পড়েছিল। একজন আসামী ছুটে গিয়ে জঙ্গলের ভেতর থেকে কতকগুলো গাছ-গাছড়া নিয়ে এসে তারই রস বের ক'রে দুর্দান্তের ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলে, তারপর তাকে কোলে নিয়ে নিজেদের ডেরার উদ্দেশ্যে রওনা হ'ল। দুর্দান্ত বেশ বুঝতে পারলে যে, এই দুটি লোক ছুটে না এলে নেকড়ের কামড় থেকে বাঁচা শক্ত ছিল। ওর শরীর থেকে অনেকটা রক্তও বেরিয়ে গিয়েছিল, কাজেই দুর্দান্ত কাহিলও হয়ে পড়েছিল খানিকটা। সেই আসামী লোকটা আর তার বৌ দিনরাত সেবা-শুশ্রূষা ক'রে দুর্দান্তের ঘাড়ের ঘা-টাকে সারিয়ে তুললে। নইলে তাকে আরও কিছুদিন ভুগতে হ'ত। এদের সেবা-শুশ্রূষা এমন আন্তরিক যে, কখনো যে আবার এদের কুটীর ছেড়ে যেতে হবে সেকথা মনে হতেই বুকটা দুর্‌দুর্‌ করতে থাকে।

লোকটা দলবল নিয়ে বনের ভেতর গাছ কেটে রাস্তা তৈরী করার কাজ করে। যুদ্ধের দৌলতেই এইজাতীয় কাজের অবশ্য চাহিদা বেড়েছে। সুতরাং তাকে অনেক সময়ই জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘোরা-ঘুরি করতে হয়। সাহসটাও সেইজন্যে অনেকের চাইতে একটু বেশী। তারও ইতিমধ্যে দুর্দান্তের ওপর বেশ মায়া প'ড়ে গেছে। আসামীর বৌ ত' বলে, আমাদের দু'টি লোকের সংসার,

দস্যিপণা

আজও একটি ছেলেপুলের মুখ দেখ্‌তে পারলামনা···তুই-ই আমাদের ছেলের মতো হয়ে থাকবি। আমাদের ছেড়ে তুইও আর কোথাও যাসনি কিন্তু। এমন আপনার মনে ক'রে আসামী-বৌ কথা বলে যে, সত্যি চোখে জল আসে। দুর্দ্দান্ত কী করবে কিছুই বুঝতে পারেনা, শুধু আপনা-থেকে কত কথা তোলপাড় ক'রে ওঠে ওর মনে। দু'দিনের মধ্যেই দুর্দ্দান্ত আসামী-বৌএর ভারী বাধ্য হয়ে উঠলো। আসামের জঙ্গলের গাছের ছায়ায় কী যে যাদু আছে কে জানে, কিন্তু তা যেন শত হাত বার ক'রে দুর্দ্দান্তকে টানতে লাগলো।

দুর্দ্দান্ত সারাটা দিন বেশ ভালোই থাকে, শুধু চারটে বাজবার সময় হলেই তার মন উন্মনা হয়ে ওঠে, ক্রমাগত সে ঘর-বার করতে থাকে। ঐসময় তাকে কেউ দেখলে মনে ভাববে, নিশ্চয়ই কুকুরটা পাগলা হয়ে গেছে!

একদিন সকালবেলা উঠে দুর্দ্দান্তের মনে হ'ল—এখানে থাকা তার আর চলবেনা। কেননা—দূরে এসে শ্রীমন্ত আরো বেশী ক'রে তার মন জুড়ে আছে। এদের স্নেহ···সে তার মনের মণি-কোঠায় অক্ষয় হয়ে রইলো, কিন্তু যেতে তাকে হবেই।

সে চুপিসারে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। চরণ তাকে টেনে নিয়ে চললো—অরণ্যের মায়া কাটিয়ে নীড়ের সন্ধানে।

দিনের আলোয় আর বুনো-জানোয়ারের ভয় নেই। এই সময়টার ভেতরই তাকে ঘন জঙ্গলটা পার হয়ে লোকালয়ে গিয়ে পড়তে হবে।

— ১৩ —

দুর্ব্বার বেগে ছুটে চলেছে দুর্দ্দান্ত। মাঝে-মাঝে পাহাড়ী-নদী, ঝরণা, খাল, বিল তাকে সাঁতরেই পার হ'তে হ'চ্ছে। সমস্তটা দিন এইভাবে দৌড়ের প্রতিযোগিতার পর সে এসে পৌঁছুলো একটা বিস্তৃত চষা-জমির ওপর। বুঝতে পারলে, কৃষাণদের বাড়ী-ঘর খুব বেশী দূর হবেনা। গা দিয়ে দরদরধারে তার ঘাম ঝরছে—সারাটা দিনের রদ্দুর একেবারে মাথার ওপর দিয়ে গেছে। ক্ষিদেয় দুর্দ্দান্তের পেটের ভেতরটা ক্রমাগত মোচড় দিচ্ছে।

একটি গাছতলায় এসে সে ক্ষণিকের বিশ্রাম নিলে। শীতল ছায়া আর মৃদু সমীরণ তার শরীরটা জুড়িয়ে দিলে। ঠিক এইসময় একটি মিলিটারী-ট্রাক ওখান দিয়ে যাচ্ছিলো। ওই ট্রাকের ভেতর কিন্তু যুদ্ধের সৈন্যরা ছিলনা, ছিল একটি লোক, যে বিভিন্ন সৈন্য-শিবিরে জন্তু-জানোয়ারের খেলা দেখিয়ে সৈনিকদের চিত্তবিনোদন করে। সম্প্রতি একটি সৈন্য-দলে খেলা দেখিয়ে সে আর-একটি সৈন্যদলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল। আসামের জঙ্গলের বিভিন্ন জায়গায় ভারতীয়-সৈন্যদের যে ঘাঁটি ছিল, সেইসব অঞ্চলে ঘুরে বেড়ানোই ছিল তার কাজ।

লোকটির সদা-জাগ্রত চক্ষু হঠাৎ আবিষ্কার করলে যে,

দস্যিপণা

এই জন-বিরল অঞ্চলের একটি গাছতলায় চমৎকার একটি কুকুর দাঁড়িয়ে আছে। সে ট্রাকের চালককে গাছের কাছ দিয়ে গাড়ীটিকে নিয়ে যেতে বললে এবং নিজে মুহূর্ত্ত মধ্যে একটি দড়ির ফাঁদ তৈরী ক'রে প্রস্তুত হয়ে রইলো।

দুর্দ্দান্ত কিন্তু ভেতরের এতটা ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারেনি। সে সোজাসুজি মনে করেছে যে, গাড়ীটা যেরকম দ্রুতবেগে চ'লে যাচ্ছে তাতে পথের মাঝখানে থামবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। সত্যি কথা বলতে কি, মিলিটারী-ট্রাকটাও তার কাছে এসে গতিটা এতটুকু হ্রাস করেনি, শুধু গাড়ীর ভেতরকার সার্কাসওয়ালা লোকটি এমন বিদ্যুৎগতিতে হাতের দড়ির ফাঁসটি ছুঁড়ে দিয়েছে যে, মুহূর্ত্ত মধ্যে দুর্দ্দান্ত তার ভেতর আট্‌কা প'ড়ে গেল। তখন ট্রাক থামিয়ে সার্কাসওয়ালা-লোকটার দুর্দ্দান্তকে গাড়ীতে টেনে তুলতে বিশেষ বেগ পেতে হ'লনা। ওই দলে আরো কয়েকটি কুকুর, খরগোস, বাঁদর প্রভৃতি জানোয়ার ছিল। পথিমধ্যে তাদের দল হঠাৎ বেড়ে গেল দেখে তারা আনন্দে কোলাহল ক'রে উঠলো।

এইভাবে দুর্দ্দান্ত মিলিটারী-সার্কাসদলে নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও নাম লিখিয়ে ফেললে। হঠাৎ এইখানে আশ্রয় পেয়ে দুর্দ্দান্তের একটি সুবিধে হ'ল এই যে, ক্ষিদের অভাবে সে যে কষ্ট পাচ্ছিলো সেই সমস্যা অতি সহজেই মিটে গেল। ট্রাকের ভেতরকার লোকটি এ-বিষয়ে খুব উদার। যারা তার উপার্জ্জনের পথ প্রশস্ত ক'রে দেয় তাদের

দুর্দ্দান্তের

সে বেশ ভালোরকম খাওয়া-দাওয়ারই ব্যবস্থা করে। দুর্দ্দান্ত এতটা পরিশ্রান্ত ছিল যে, গাড়ীর ভেতরকার খানা খেয়ে আর গাড়ীর ক্রমাগত ঝাঁকুনীতে সে খানিকটা বাদেই একেবারে ঘুমিয়ে পড়লো। যখন তার ঘুম ভাঙলো—অন্য একটি সৈন্য-শিবিরে এসে তখন তারা পৌঁছেচে। তক্ষুনি তাদের খেলার জন্যে প্রস্তুত হ'তে হবে। কেননা, সন্ধ্যা-বেলা ভারতীয়-সৈনিকদের আনন্দ-পরিবেশন করবার জন্যেই ট্রাকটি দ্রুতবেগে ছুটে আসছিল।

যেখানে খেলা দেখানো হবে সে-জায়গাটা আগে-থেকেই সাজানো ছিল। সাজ-ঘর হিসেবে একটি তাঁবু খাটিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সার্কাসওয়ালা অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারদের নিজ-নিজ পোষাক পরিয়ে খেলার জন্য তৈরী করিয়ে রাখলে। কিন্তু দুর্দ্দান্তের পোষাক ছিলনা ব'লে একটি ক্লাউনের (বাঁদরের) পোষাকে তাকে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হ'তে হ'ল।

মজার কথা এই যে, যে ছিল সব-চাইতে অপ্রস্তুত সেই দুর্দ্দান্তই সেদিনকার খেলায় সব-চাইতে বেশী হাততালি পেলে। সার্কাসওয়ালা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ঘন-ঘন গোঁফে তা দিতে লাগলো। সেদিন রাত্রে নিজস্ব প্রাপ্য ছাড়া সার্কাসওয়ালা সৈনিকদের কাছ থেকে বহু বক্‌সিস্ পেয়ে গেল। মনে-মনে বুঝলে, এইবার থেকে তার বরাতটা সত্যি বুঝি খুলে গেল।

দাস্যিপনা

রাত্তিরবেলা সমস্ত জানোয়ারকে খাঁচায় পুরে একটা তাঁবুর ভেতর রেখে দেওয়া হ'ল। কেননা, বাইরে থাকলে আশেপাশের বন্য-জন্তুর ভয় রয়েছে।

খরগোস, বাঁদর, ছাগল, কুকুর, ভেড়া প্রভৃতি অন্যান্য জানোয়াররা ভাবলে, ভালো-রে-ভালো, আমরা সবাই খেলা দেখিয়ে দিব্যি নাম ক'রে ছিলাম আর খাওয়া-দাওয়াটাও জুটছিল ভালো, আবার এই নতুন কুকুরটা কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসলো? একে তাড়াতেই হবে। সবাই মিলে বুদ্ধি-পরামর্শ ক'রে অন্যান্য কুকুরগুলিকে দুর্দান্তের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিলে। গভীর রাত্রে ভীষণ কামড়া-কামড়ি সুরু হয়ে গেল। চেঁচামেচি শুনে সার্কাসওয়ালা নিজে বেরিয়ে এলো। দেখলে, ইতিমধ্যেই দুর্দান্তকে ওরা সবাই মিলে ঘায়েল ক'রে ফেলেছে। তখন সে খাঁচার ভেতর থেকে দুর্দান্তকে বের ক'রে নিয়ে এলো। প্রত্যেক সৈন্য-শিবিরে একজন ক'রে ডাক্তার থাকেন। আকস্মিক একটা দুর্ঘটনা হ'লে প্রাথমিক-চিকিৎসার জন্যে তাদের রাখা হয়। সার্কাসওয়ালা দুর্দান্তকে নিয়ে সেই ডাক্তারের কাছে হাজির হ'ল এবং প্রাথমিক-চিকিৎসার ব্যবস্থা ক'রে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়ে নিলে। সেই রাতটা দুর্দান্ত সার্কাসওয়ালার খাটিয়াতেই কাটিয়ে দিলে। খাঁচার ভেতর অন্যান্য জানোয়ারের সঙ্গে আর তাকে থাকতে হ'লনা। পরদিন সকালবেলা উঠে সার্কাসওয়ালা তাদের নিয়ে আবার অন্য একটি সৈন্য-শিবিরে রওনা হ'ল।

দুর্দ্দান্তের

দুর্দ্দান্তকে সেদিন আর খেলা দেখাতে হবেনা। তাকে একেবারে পুরোপুরি বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে।

চুপচাপ ব'সে সে বাজনা শুনছে। বাইরের তাঁবুতে রীতিমত খেলা দেখানো স্থরু হয়ে গেছে। দুর্দ্দান্ত বুঝলে, এই উপযুক্ত অবসর। এরপর থেকে আবার তাকে রীতিমত খেলা দেখানো স্থরু করতে হবে, তখন আর সে আদপেই ছাড়া পাবেনা। এখন গলায় তার শেকল নেই। সার্কাসওয়ালা তাকে অসুস্থ মনে ক'রে চুপচাপ একপাশে শুইয়ে রেখে দিয়েছে। গত রাত্তিরের আঘাত—ডাক্তারী ওষুধে তার বেমালুম সেরে গেছে।

একবার উঁকি মেরে দেখলে যে, সার্কাসওয়ালা বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে খেলা দেখছে আর পাইপে ক'রে ধূমপান করছে। দুর্দ্দান্ত এক-পা দু-পা ক'রে তাঁবুর পেছনদিক দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। সন্ধ্যে হবার এখনো অনেকটা দেরী আছে। এই সময়টার ভেতর একটা লোকালয় খুঁজে নিয়ে রাত্রির জন্য বিশ্রাম নিতে হবে। আর বেশী বিবেচনা করলে ধরা প'ড়ে যাবার সম্ভাবনা। কেননা, সার্কাসওয়ালা কখন তার সন্ধান নিতে আসবে বলা শক্ত! দুর্দ্দান্ত একেবারে এক-ছুটে মিলিটারী-আস্তানা ছেড়ে বেরিয়ে এলো। সৈনিকেরা সবাই খেলা দেখতে মত্ত, সুতরাং তার পলায়ন কেউ আদপেই লক্ষ্য করলেনা।

— ১৪ —

দুর্দ্দান্ত ততক্ষণে অজানার পথে পা বাড়িয়েছে। সে যখন ছুটে চলে···ডাইনে, বামে আদপেই তাকায়না। একটা সোজা রাস্তা সে বেছে নিলে। রাস্তাটা নতুন তৈরী হয়েছে আর মিলিটারী-আস্তানা থেকে একেবারে লোকালয়ের দিকে চ'লে গেছে।

দুর্দ্দান্ত বুঝলে, এই পথই তাকে আশ্রয় দেবে। সেই রাস্তা ধ'রে গেলে একমাইল হোক, দু'মাইল হোক, অন্তত বেশ-কিছু দূরেও সে রাত্তিরে থাকবার মতো একটি ডেরা খুঁজে পাবে। সে তার গতির বেগ আরও খানিকটা বাড়িয়ে দিলে।

হঠাৎ একটা চীৎকার শুনে সে থম্‌কে দাঁড়ালো। সার্কাস-ওয়ালা কি তার পালাবার কথা জানতে পেরে তার পিছু নিয়েছে? না, তা নয়। একটি পথিক যাচ্ছিলো সেই পথটা ধ'রে। হঠাৎ একপাশের ঝোপের ভেতর থেকে দুটি লোক লাঠি হাতে বেরিয়ে তাকে আক্রমণ করেছে। মনে হ'ল, পথিকটির কাছে টাকা-পয়সা রয়েছে এবং সে যে এই পথ দিয়ে ফিরবে লোক দুটো যেমন করেই হোক আগে তার সন্ধান পেয়েছিল।

চোখের পলক ফেলতে যতটুকু সময় লাগে···

দুর্দ্দান্ত ঠিক দস্যুর মতো লাফিয়ে প'ড়ে

একটা ডাকাতের টুঁটি কামড়ে ধরলে। আর-একটি লোক পথিকটির মাথার ওপর লাঠি উঁচিয়েছিল, হঠাৎ সঙ্গীটির অবস্থা দেখেই লাঠি ফেলে জঙ্গলের মধ্যে একেবারে চোঁচা দৌড়!

ততক্ষণে আর-একটি ডাকাত কামড়ের তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে।

পথিকটি এইভাবে অপ্রত্যাশিতভাবে বেঁচে গিয়ে তাকিয়ে দেখলে, একটি কুকুর যেন ঠিক ভগবানের দ্বারা প্রেরিত হয়ে তার প্রাণ রক্ষা করেছে। মনে-মনে সে সৃষ্টিকর্ত্তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলে, তারপর কুকুরটিকে পরম আদরে কোলে তুলে নিলে।

দুর্দ্দান্ত কিন্তু আদপেই আপত্তি জানালেনা। কেননা—আজকের রাত্তিরের মতো যে আশ্রয় সে চেয়েছিল তা আপনা-থেকেই তার জুটে গেল।

পথিকের বাড়ী পৌঁছে দুর্দ্দান্ত বুঝতে পারলে যে, তার অবস্থা বেশ ভালো। গৃহস্বামীর মুখে সমস্ত ঘটনা শুনে বাড়ীর লোকেদের কাছে দুর্দ্দান্তের খাতির খুব বেড়ে গেল।

বাড়ীর গিন্নি ছুটে এসে ওকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন, আমি সোনা দিয়ে ওর পা বাঁধিয়ে দেবো। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি চাকরকে ডেকে হরির লুটের ব্যবস্থা করতে বললেন। পরের উপকার ক'রে আদর পেতে কার না ভালো লাগে? দুর্দ্দান্ত কোলে উঠে শুধু তার দুষ্টু চোখ দুটো পিট্‌পিট্‌ করতে লাগলো।

দাস্যপণ

বাড়ীতে একজন বড় কুটুম এলে যেমন সাড়া প'ড়ে যায়, দুর্দ্দান্তকে নিয়ে ঠিক সেইরকম হৈ-হৈ সুরু হয়ে গেল। সে কী খাবে এবং কোথায় তার শয়নাগার হবে এই নিয়েই একটা বৈঠক ব'সে গেল। কর্ত্তা বললেন, ও আমার জীবন-রক্ষা করেছে··· আমার কাছেই ও থাকবে। কিন্তু খাওয়ার ব্যবস্থা তোমরা করো।

ছেলেরা বললে, ওকে ত' মাংস খাওয়াতে হবে।

ঘরে কতকগুলো পায়রা ছিল, তারই একটাকে মারা হ'ল সম্মানী-অতিথির আদর-আপ্যায়নের জন্যে।

দুর্দ্দান্তের একটি কথা মনে প'ড়ে গেল। সে শ্রীমন্তদের বাড়ী একটি জংলা পায়রা মেরেছিল ব'লে শ্রীমন্তর মা তাকে যা-নয়-তাই ব'লে গালাগালি দিয়েছিলেন। সেই নাকি ও-বাড়ীর সর্ব্বনাশ ডেকে এনেছে। অথচ আজ সে এ-বাড়ীর লোককে মস্ত বড় সর্ব্বনাশ থেকে বাঁচিয়েছে···মানুষগুলো অদ্ভুত লোক কিন্তু। নিজের সুবিধের জন্য মনগড়া কথা তৈরী ক'রে নেয় আর অতি সহজভাবেই নিজের দোষ অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচে!

তবু সে ওই বাড়ী ছেড়ে থাকতে পারবেনা। কেননা—শ্রীমন্তের মা-বাবার যতই দোষ থাক···শ্রীমন্তকে সে ভালোবাসে। এমন ক'রে প্রাণ ঢেলে আর কেউ-ই যে তাকে কাছে ডেকে নেয়নি। শ্রীমন্তর কথা মনে হ'লে সে একেবারে পাগল হয়ে ওঠে। তারই জন্যে ত' সে এত কষ্ট
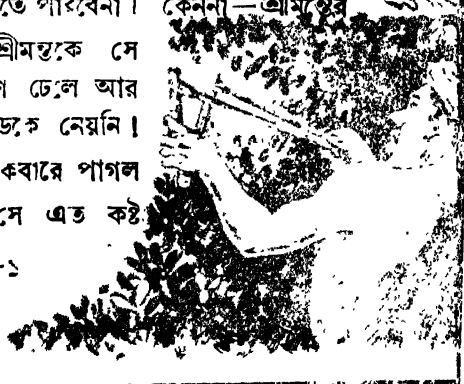
দুর্দ্দান্তের

স্বীকার ক'রে দেশের এক প্রান্ত থেকে সুরু ক'রে আর-এক প্রান্তের দিকে রওনা হয়েছে। আচ্ছা, শ্রীমন্তও কি ঠিক এমনি ক'রে তার জন্যে ভাবে? রোজ রাত্রে কি তার বিছানার একটা পাশ খালি-খালি লাগে? সে কি সামান্য একটা কুকুরের জন্যে চোখের জল ফেলে তার বালিশ ভিজিয়ে দেয়?

মুস্কিল এই যে, মানুষরা তাদের মনের কথা আদপেই বুঝতে পারেনা। কিন্তু সে ত' মানুষের মনের কথা ঠিক বুঝে নেয়। শ্রীমন্ত কিন্তু তার মনের কথা ঠিক-ঠিক বুঝতে পারতো।

প্রায় সারাটা রাত দুর্দ্দান্তকে নিয়ে হৈ-হৈ ক'রে বাড়ীর লোকজনেরা সকালের দিকে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লো। এই অবসরে দুর্দ্দান্তের বাঁধন কাটতে হবে। ওরা যদি সবাই জেগে ওঠে তখন এদের স্নেহের মায়া-পাশ কাটিয়ে চ'লে যাওয়া বড় শক্ত হবে।

সকাল-বেলাকার সোনালী অরুণ তখনো পূব-আকাশের কোলে উঁকি দেয়নি।

দুর্দ্দান্ত মনে-মনে সবাইকার কাছে বিদায় নিয়ে রওনা হ'ল। বাড়ীর গিন্নি তার পা সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। সে সেইজন্যে তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে আপনমনেই বললে যে, সোনা কিম্বা লোহা কোনো শেকলেই সে এমন ধরা পড়তে চায়না।

কিন্তু বিদায়ের সময় মনকে ভারাক্রান্ত ক'রে কোনো লাভ নেই···তাকে পাড়ি জমাতে হবে অনেক দূরের পথ।

সূর্য্য ওঠবার আগেই তাকে এই অঞ্চল ছেড়ে চ'লে যেতে

হবে। নইলে ঘুম থেকে উঠে গৃহস্বামী নিশ্চয়ই তার জীবন-দাতার সন্ধান করবার জন্যে এদিক-ওদিক লোক পাঠাবেন। বাড়ীর গিন্নির একপক্ষে কিন্তু ভালোই হ'ল। কুকুরের পা আর সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিতে হবেনা। সেই সোনায় কয়েকটি মোটা আর ভারী-ভারী গয়না হবে। শেষপর্য্যন্ত তিনি দুর্দ্দান্তকে ধন্যবাদ দেবেন নিশ্চয়ই।...সে অনেক-কিছু ভাবছিল আর আপন মনে হাসছিল। কিন্তু মুস্কিল এই যে, কুকুররা যে হাসতে পারে, মানুষরা তা' বিশ্বাস করতে চায়না।

কাল রাত্রে যে-লোকটার টুঁটি টিপে ধরেছিল তার মৃতদেহটা এখনও রাস্তার পাশে প'ড়ে রয়েছে। রোদ উঠলেই এখানে ভীড় জমে যাবে আর আসল কথাটা জানতেও কারো বাকি থাকবেনা। কিন্তু হাততালি আর প্রশংসা কুড়োবার জন্যে সে তখন আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকবেনা। আশে-পাশে যদি সংবাদ-সংগ্রাহক কেউ থাকে, সে খবরটা লিখে পাঠাবে কলকাতার কোনো কাগজে। বড়-বড় হরফে কালই বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে :

"কুকুর কর্ত্তৃক অদ্ভুতভাবে
পথিকের জীবন রক্ষা!!
মরণ-কামড়ে আততায়ী নিহত!!!"

মানুষগুলো বেশ!

সামান্য-সামান্য ঘটনাকে এমন ফলাও ক'রে লিখতে পারে যে, ওদের মুন্সীয়ানার প্রশংসা
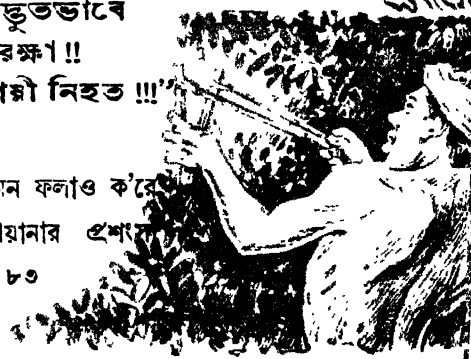
করতেই হয়। সারা জীবনে ওরা কাজ করে যত না,—অকাজ করে তার চাইতে বেশী : আর নিজেদের প্রশংসায় ওরা পঞ্চমুখ। দুর্দ্দান্ত যদি আজ গৃহস্বামীর কাছে থেকে যেতো তবে একটা ব্যাপার হ'তো এই যে, সবাই মিলে হয়তো তার ফটো তুলে নিতো, আর চাই-কি কলকাতার খবরের কাগজগুলিতে সেই ফটো ছাপা হয়ে বেরুতো। কোনোরকমে একটি কাগজ যদি শ্রীমন্তের হাতে গিয়ে পড়তো ত' সে নিশ্চয়ই বুঝতে পারতো যে, দুর্দ্দান্ত এখনো বেঁচে আছে—আর সে একটি লোকের প্রাণ বাঁচিয়েছে। তার মনে কি তখন একটুও আনন্দ হ'তনা ?

ভাবতে-ভাবতে দুর্দ্দান্ত তার পায়ের গতি আরও বাড়িয়ে দিলে। আরো খানিকটা পথ চলবার পর সে বুঝতে পারলে যে, জমিটা সামনের দিকে ক্রমশ নীচু হয়ে যাচ্ছে। সামনে একটা বড় রকম নদী থাকবে নিশ্চয়ই। তার আভাসও সে আকাশের দিকে লক্ষ্য ক'রে বুঝতে পারলে। কিন্তু এই নদী সে পার হবে কি ক'রে ? নদীর ধার পর্য্যন্ত ত' আগে যাওয়া যাক্, তারপর সেকথা যথাসময়ে বিবেচনা ক'রে দেখলেই হবে।

ছোটখাটো নদী হ'লে দুর্দ্দান্ত অতি সহজেই সাঁতরে পার হয়ে যেতে পারে ; কিন্তু নদী যদি চওড়া হয় তবেই বিপদ। কেননা, সেইসব নদীর মধ্যে কুমীর থাকে। নদীর জলে কুমীর যদি একবার ঠ্যাং ধরতে পারে তবে—মানুষরা যেভাবে রসগোল্লা টপ্ ক'রে গিলে ফেলে, ঠিক সেইরকম ক'রে সে জলযোগ সেরে ফেলবে।

— ১৫ —

দুর্দ্দান্ত আবার ছুটলো নদীর দিকে।

নদীটা বড় বৈকি। সামনেই একটা বড় ষ্টেশন। সেখান থেকে একটা ষ্টীমার ছাড়বে ব'লে মনে হ'ল।

ষ্টীমারটা ঘাটে ভেড়ানো রয়েছে। ষ্টেশনে লোকজন সব গিস্‌গিস্ করছে। যত লোক নামছে—উঠছে তার চাইতে অনেক বেশী। সৈনিকদের জন্যে খাবার-দাবার, জিনিসপত্র যা নামানো হয়েছে—নদীর কিনারে একপাশে তা স্তূপাকার ক'রে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। ধীরে-ধীরে দুর্দ্দান্ত সেইসব জিনিসপত্রের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো। মনে-মনে যে একটু ভয় না আছে তা নয়। কোনো মিলিটারীর লোকও ত' তাকে বগল-দাবা ক'রে নিতে পারে। তাছাড়া, কয়েকটি সৈন্যাবাস থেকে সে পালিয়েছে। ওদিকে আবার সার্কাসওয়ালারও ভয় আছে। সে-ও ত' এই ষ্টীমারের যাত্রী হ'তে পারে। মুখটা বাড়িয়ে সে যতদূর সম্ভব এদিক-ওদিকটা একবার ভালো ক'রে দেখে নিলে।

নাঃ, তার ভয় পাবার মতো বিশেষ কিছু নেই। কিন্তু বিপদ হ'ল এই যে, ষ্টীমারে উঠবে কি ক'রে? মালিক-বিহীন অবস্থায় ত' তাকে উঠতেই দেবেনা, আর মালিক জুটলেও তার জন্যে আলাদা টিকিট করতে হবে। এই

দুর্দান্তের

দুর্দিনের বাজারে-কে তার জন্যে টিকিট কিনবে ? হঠাৎ তার নজর গেল পাশের দিকে···একটি বাঙালী-মেয়ে শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছে। বোধকরি নতুন বিয়ে হয়েছে ; সঙ্গে অনেক জিনিসপত্র, মোট-ঘাট। আত্মীয়-স্বজনরা তাকে বিদায় দেবার জন্যে ষ্টীমারঘাটে এসেছে।

মেয়েটি এতক্ষণ চোখে আঁচল দিয়ে কাঁদছিল, হঠাৎ দুর্দান্তের দিকে নজর পড়তেই তার চোখ-মুখ একমুহূর্ত্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সে তার দাদাকে বললে, দাদা, দেখছো, আমাদের 'টার্জ্জন' ফিরে এসেছে। নিশ্চয়ই বাড়ী গিয়েছিল আগে, সেখানে আমাকে পায়নি তাই ছুটে ষ্টীমারঘাটে এসেছে আমায় দেখতে।

দুর্দান্ত বুঝলে, ওদের 'টার্জ্জন' ব'লে একটি কুকুর ছিল, অবিকল তারই মতো দেখতে···হয়তো পালিয়ে গেছে, কিম্বা হারিয়ে গেছে। তারা ওকে 'টার্জ্জন' বলেই ভুল করেছে। কেননা, ছেলেটিও মুখ ফিরিয়ে বললে, তাইতো বিনি ! এদ্দিন বাদে 'টার্জ্জন' কোত্থেকে ফিরে এলো আমি ত' কিছুই বুঝতে পারছিনে !

বিনি বললে, আমি ঠিক বলছি, আমার মায়াতেই ও ফিরে এসেছে। আমি ওকে এতটুকু থেকে মানুষ করেছি। আর আমাকে এত ভালো ও বাসতো ! ও ঠিক বুঝতে পেরেছে যে, বিয়ে হয়ে আমি দূর দেশে চ'লে যাচ্ছি তাই ঠিক এসে হাজির হয়েছে। তোমরা তখন বলতে, 'টার্জ্জন' পালিয়ে গেছে, কিন্তু তা মোটেই নয়···ওকে কেউ চুরি ক'রে নিয়ে গিয়েছিল। দেখছোনা, গলায়

দস্যিপণা

বগলস্…চেনটা ছেঁড়া! নিশ্চয়ই সেখান থেকে সুযোগ বুঝে পালিয়ে এসেছে।…টার্জ্জন? টার্জ্জন?

মেয়েটি আকুল আগ্রহে দু'হাত তুলে দুর্দ্দান্তকে ডাকতে লাগলো। দুর্দ্দান্ত বুঝলে, এখানে ধরা দেওয়া বুদ্ধিমানেরই কাজ হবে। কেননা, নদী পেরুতে হবে ত'! আস্তে-আস্তে গিয়ে দুর্দ্দান্ত মেয়েটির গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। বিনু তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধ'রে কোলের মধ্যে টেনে নিলে. বললে, টার্জ্জন, তুই এত বড়টি হয়ে গেছিস? কি ক'রে এদ্দিন আমাকে ছেড়ে ছিলি বল্ তো?

বিনির পিশিমা বিনির সঙ্গে তার শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছিলেন। তিনি নাক সিঁটকে, ভ্রূ কুঁচকে বললেন, হুঁ! আদিখ্যেতা দেখে আর বাঁচিনে। যাচ্ছে শ্বশুরবাড়ী—একটা নোংরা কুকুরকে নিয়ে টানাটানি। আমি এমন ক'রে ঠাকুরের নির্ম্মাল্য ছুঁইয়ে যাত্রা করিয়ে দিলাম—সব মাটি করলে হতচ্ছাড়ী!!

বিনি আহ্লাদে আটখানা হয়ে জবাব দিলে, আমি টার্জ্জনকে সঙ্গে নিয়ে যাবো পিশিমা। ওখানে ত' লোকজন খুব কম—টার্জ্জন আমাদের পাহারা দেবে।…না দাদা, ভারী চমৎকার হবে।

পিশিমা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বললেন, এমন অনাচ্ছিষ্টি কথা ত' বাপের জন্মেও শুনিনি। যাচ্ছিস শ্বশুরবাড়ী, আবার একটা কুকুর সঙ্গে কেন? কুকুর নিয়ে গেলে কিছুতেই আমি তোর সঙ্গে যাবোনা এই সোজা কথা ব'লে দিলাম।

বিনি পিশিমার গলা ধ'রে বললে,
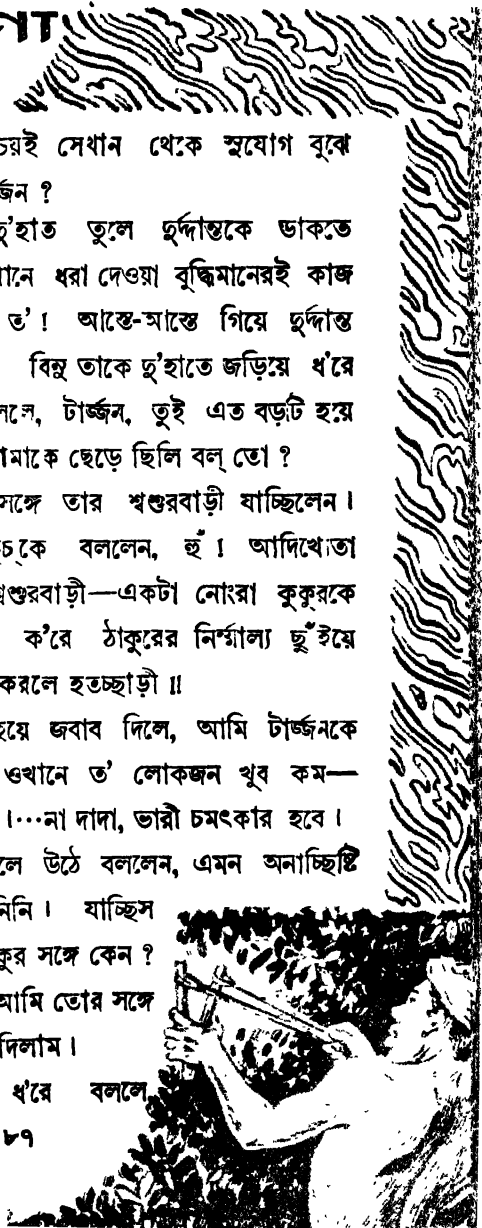
দুর্দান্তের
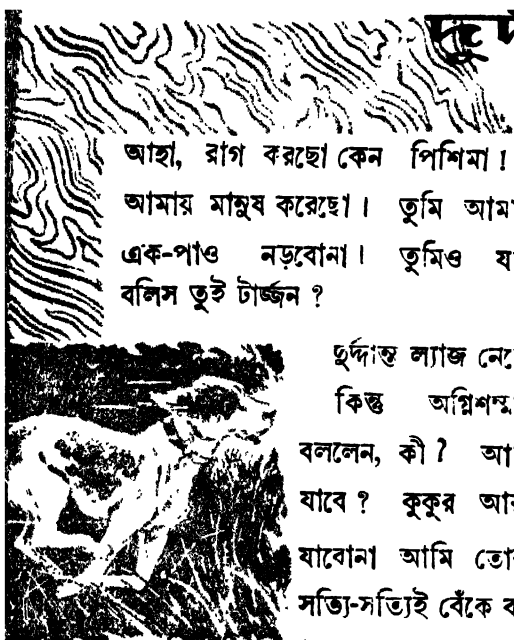
আহা, রাগ করছো কেন পিশিমা! আমার ত' মা নেই, তুমিই আমায় মানুষ করেছো। তুমি আমার সঙ্গে না গেলে আমি এক-পাও নড়বোনা। তুমিও যাবে—টার্জ্জনও যাবে।…কি বলিস তুই টার্জ্জন?

দুর্দ্দান্ত ল্যাজ নেড়ে সম্মতি জানালে।

কিন্তু অগ্নিশর্ম্মা হয়ে উঠলেন, পিশিমা। বললেন, কী? আমিও যাবো, আবার কুকুরও যাবে? কুকুর আর আমি কি সমান? যা, যাবোনা আমি তোর সঙ্গে। পিশিমা এইবার সত্যি-সত্যিই বেঁকে বসলেন।

বিনি কিন্তু আচ্ছা মেয়ে। সে সবাইকার মন রাখতে চায়। পিশিমাকে বুঝিয়ে বললে, আচ্ছা পিশিমা, তুমি আমায় এত ছোট থেকে এত বড়টি ক'রে তুলেছো—আমার ওপর তোমার একটা মায়া হয়ে গেছে। আর আমিও ত' এই টার্জ্জনকে একমাসের থেকে এত বড়টি ক'রে তুলেছি। আমারও ত' কিছু মায়া-মমতা আছে। একটা বছরই নাহয় টার্জ্জন ছিলনা…ওকে কে চুরি ক'রে নিয়ে গিয়েছিল। আজ ও আমার কাছে ফিরে এসেছে… দেখোনা, আমার দিকে কেমন ক'রে তাকাচ্ছে, ওকে কি আমি ফেলে যেতে পারি? তুমিই বলোনা পিশিমা!

মনে হ'ল বিনির কথায় পিশিমার মনটা নরম হয়ে এসেছে।

বিনি তখন আবার বললে, আরও শুনেছি—ওখানে ভয়ানক চোর-ডাকাতের ভয়। টার্জ্জনের মতো একটা পাহারাদার থাকলে রাত্তিরবেলা আমরা নিশ্চিন্ত…কি বলো পিশিমা?

দস্যিপণা

এইবার চোর-ডাকাতের কথা শুনে পিশিমা সত্যি ভয় পেয়ে গেলেন। বললেন, বলিস কি বিনি—চোর-ডাকাতের ভয় ? তা তো তুই আগে আমায় কিছু জানাসনি বাছা।

বিনি বললে, জানালে তুমি আমার সঙ্গে যেতে রাজী হ'তে না।

বিনির কথায় পিশিমা যেন একেবারে জল হয়ে গেলেন। তারপর দাদার দিকে চেয়ে বিনি বললে, তুমি যে এখনো দাঁড়িয়ে রইলে দাদা—টার্জ্জনের জন্যে টিকিট কিনতে হবেনা ? ষ্টীমার বোধহয় আর বেশীক্ষণ দাঁড়াবেনা, এইবার আমাদের উঠতে হবে।

বিনির দাদা ব্যস্ত হয়ে বললে, সত্যি কথাই বলোছস বিনি। টার্জ্জনকে যদি তুই নিয়ে যাস তবে ত' আলাদা টিকিট করতেই হবে। এই ব'লে সে ছুটতে-ছুটতে টিকিটঘরের দিকে চ'লে গেল। দুর্দ্দান্তও অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বিনির কোলের ওপর ব'সে পড়লো।

বিনি বললে, দেখছো পিশিমা, টার্জ্জন এখনো আমায় ভুলতে পারেনি, ঠিক আগেকার মতো কেমন এসে কোলের ওপর ব'সে পড়লো। তুমি দেখে নিও পিশিমা, বাবা যখন শুনবেন যে, টার্জ্জনকে আমরা আবার পেয়েছি আর সে আমার সঙ্গেই গেছে—তখন তিনি ভারী খুশী হবেন।

পিশিমা মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে জবাব দিলে, তোর বাবাই ত' আদর দিয়ে-দিয়ে তোর মাথাটা খেয়েছে।

এইবার বিনি ছোট মেয়ের মতো খিল্‌খিল্‌
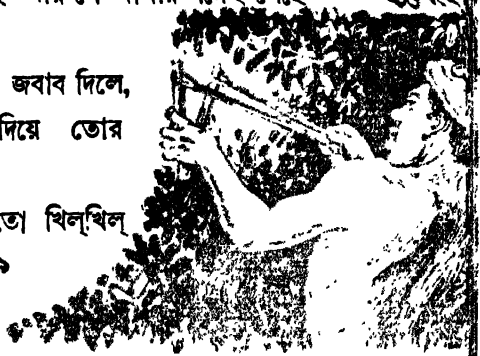
ক'রে হেসে উঠলো। বল্‌ল, আদর কি আমায় শুধু বাবাই দিয়েছেন? তুমি দাওনি? এই ব'লে সে তার পিশিমার গলা জড়িয়ে ধরলে।

পিশিমার নাকটা আবার কুঁচকে উঠলো। তিনি একটু স'রে গিয়ে বললেন, ওই নোংরা কুকুরটা কোলে নিয়েই আমায় ছুঁয়ে দিলি ত'? জাত-জন্ম আর কিছু রইলোনা দেখছি!

বিনি আবার হেসে উঠে জবাব দিলে, আমায় ছুঁলে যদি তোমার জাত না যায় ত' টার্জ্জনকে ছুঁলেও কিছু হবেনা পিশিমা। দেখো, ও তোমায় কেমন ভয়-ভক্তি করবে—যেমন আমি করি। সব আমি শিখিয়ে দেবো।…শিখ্‌বিনে আমার কাছ থেকে টার্জ্জন?

দুর্দ্দান্ত মাথা দোলাতে লাগলো নিজেরই উৎসাহে। এই বিনি মেয়েটি যেন আনন্দের ঝরণা। ও একাই সবাইকে মাতিয়ে রাখতে পারবে। বিনির ওখানে গিয়ে দিনগুলি কেমন আনন্দে কাটবে কল্পনা ক'রে দুর্দ্দান্ত আগে-থেকেই পুলকিত হয়ে উঠতে লাগলো।…আচ্ছা, বিনি যদি শ্রীমন্তের বড় বোন হ'ত ত' কেমন হ'ত! সবাই একই বাড়ীতে হুল্লোড় ক'রে বেশ থাকা যেতো। হসন্ত একেবারে ছোট, তার ত' আর বুদ্ধি-শুদ্ধি হয়নি, তার কাছ থেকে আদর আর কি পাওয়া যাবে?

পিশিমা বললেন, কি রে, ব'সে-ব'সে নোংরা কুকুরটাকে নিয়ে সোহাগ জানাবি, না, ইষ্টিমারে গিয়ে উঠতে হবে? যে রকম সিটি বাজাচ্ছে—ছেড়ে দেবে বুঝি এক্ষুনি!

— ১৬ —

বিন্নুর দাদার সঙ্গে সবাই গিয়ে যখন জামাইবাড়ী হাজির হ'ল তখন দুর্দ্দান্তের বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ ক'রে উঠছে। কারণ, জামাই কি রকম লোক হ'বে তা তো বলা যায়না।

যদি রাগী মানুষ হয় আর দুর্দ্দান্তকে মারতে আসে তবে সে-ও সহজে ছেড়ে দেবেনা। চাই-কি দু'একটা কামড়ও বসিয়ে দিতে পারে। কিন্তু মনে-মনে আপ্‌সোসই রয়ে গেল শুধু। বিনির বাবা জামাইকে যে টেলিগ্রাম করেছিলেন তা এখানে পৌঁছুবার আগেই জামাইবাবু 'টুরে' বেরিয়ে গেছেন। ঠাকুর, চাকর, ঝি সবাই অবশ্য তটস্থ হয়ে আছে কখন তাদের গিন্নিমা এসে হাজির হন!

বিনি বাংলো-ধরনের বাড়ী দেখে খুব খুশী। পিশিমা প্রথমেই খবর নিলেন, গঙ্গা কতদূর? যখন জানা গেল যে, প্রত্যহ গঙ্গা স্নান করা চলবে—তখন তিনি নিশ্চিন্ত মনে একটা কোণের ঘরে গিয়ে মালা জপতে সুরু ক'রে দিলেন।

বিনি তাকে গিয়ে বললে, ভাগ্যিস টার্জ্জন আমাদের সঙ্গে এসেছিল, নইলে রাত্তিরে উনি নেই বাড়ী···ভয়ানক ভয়ের কথা পিশিমা—

পিশিমা মালা জপ করা সাময়িকভাবে বন্ধ রেখে, চোখ দুটো কপালের ওপর

তুলে বললেন, অ্যাঁ! তুই বলিস কি বিনি? চোর-ছ্যাঁচড়ের উপদ্রব বুঝি খুব এখানে?

বিনি খিল্‌খিল্‌ ক'রে হেসে উঠে জবাব দিলে, চোর-ছ্যাঁচড় কি বলছো পিশিমা? একেবারে ডাকাত।...কানে যাদের জবাফুল গোঁজা থাকে...তারা একবার হা—রে—রে—রে শব্দে দয়া ক'রে হাজির হলেই হ'ল।

শুনে পিশিমা সত্যিই শঙ্কিত হয়ে উঠলেন, বললেন, তা, কাজ কি বাপু জামায়ের এই পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশে চাকরি করবার!

বিনি এইমাত্র খবর নিয়ে এসেছে যে, আগামী-কাল সকাল বেলাতেই গৃহস্বামী এসে হাজির হবেন। শুধু আজকের রাতটাই একটু ভয়ে-ভয়ে কাটাতে হবে।

আসল কথা এই যে, এখানে চোর-ডাকাতের ভয় থাক্ আর না থাক্ তাদের অস্তিত্বের কথা জোরগলায় ঘোষণা ক'রে 'টার্জ্জনের' প্রয়োজনীয়তাটাকে ভালো ক'রে বুঝিয়ে দেবার জন্যেই বিনি এইরকম প্রচার কার্য্য চালিয়েছিল। কিন্তু কথায় বলে, যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যে হয়। কয়েকটা স্থানীয় চোর কি ক'রে খবর পেয়েছে যে, নতুন বিয়ের ক'নে অনেক গয়নাগাটি আর জিনিসপত্র নিয়ে বাংলোতে এসে হাজির হয়েছে, কিন্তু গৃহস্বামী অনুপস্থিত। এ-সুযোগ তারা কখনো ছেড়ে দেয়?

গভীর রাত্রে এসে তারা বাড়ীতে সিঁদ দিলে আর হাজির হ'ল গিয়ে একেবারে খোদ পিশিমার ঘরে। পিশিমার সঙ্গে ছিল কিছু

সোনাদানা, কিছু নগদ টাকা আর পিশেমশায়ের নিজের ব্যবহার-করা একটি মুক্তোর আংটি।

এমনিতেই ত' হাঁপানির ব্যামোর জন্যে রাত্তিরে পিশিমার ঘুম খুব কম হয়, তাতে আবার নতুন জায়গা, তার ওপর বিনি যেরকম ভয় দেখিয়ে গেছে তাতে ঘুমটা একেবারে চোখের পাতা থেকে ছুটি নিয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

এত গভীর রাত্রে ঘরে খুট্-খাট্ ঠুং-ঠাং আওয়াজ কিসের? পিশিমার চিরকালের অভ্যাস বালিশের নীচে একটি ক'রে দেশালাই রাখা, কি জানি কখন দরকার পড়ে। তাড়াতাড়ি তিনি সেই দেশালাই নিয়ে প্রদীপ জ্বালতে গেছেন। কিন্তু দেশালাইটা কি জলে-ভেজা? আগুন যে আর কিছুতেই জ্বলেনা। ফস্ ক'রে একটা কাঠি জ্বলেই আবার তখুনি নিভে গেল।

যেই চম্‌কে ওঠা…আলোর ঝিলিকে পিশিমা চোখ দুটো বড়-বড় ক'রে দেখলেন, দুশমনের মতো চেহারা নিয়ে কারা সব ঘরে ঢুকে আতিপাঁতি ক'রে কি সব খোঁজাখুঁজি করছে।

পিশিমা একেবারে হাউমাউ ক'রে চীৎকার ক'রে উঠলেন। প্রথমটা চীৎকার, তারপর ফোঁপানি…এমন মরা-কান্না বোধকরি তিনি পিশেমশায়ের মরার দিনেও কাঁদেননি।

চোরের দল দেখলে, সমূহ বিপদ। এই বুড়ীই তাদের হাতে-নাতে ধরিয়ে দেবে। তখুনি ছুটে গিয়ে একজন বুড়ীর মুখে একটা কাপড় গুঁজে দিলে। এই ব্যাপারের ফলে

দুর্দ্দান্তের

পিশিমার হাঁপানি গেল আরো বেড়ে আর তিনি এমন হাঁস-ফাঁস করতে লাগলেন যে, পাশের ঘর থেকে মনে হ'ল কেউ বুঝি ষ্টোভ জ্বেলেছে।

পিশিমার ঠিক পাশের ঘরে রয়েছে দুর্দ্দান্ত আর বিনির দাদা, আর তার পরের ঘরে—বিনি। দুর্দ্দান্তের চোখেও ত' ঘুম নেই-ই একেবারে। হঠাৎ আওয়াজ পেয়ে তার সন্দেহ হ'ল, তখুনি সে তড়াক্ ক'রে উঠে জানলা গ'লে একেবারে লাফিয়ে পড়লো পিশিমার অন্ধকার ঘরে।

দুশমনের মতো চেহারার লোকেরা এইবার সত্যি হকচকিয়ে গেল। কেননা—এবার এসেছে দুশমনদের ঠাকুর্দ্দা একেবারে স্বয়ং দুর্দ্দান্ত। ওরা বুঝতে পারলে যে, বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা। কাজটা উচিত হয়নি। ততক্ষণে দুর্দ্দান্ত একজনের ঘাড় কামড়ে ধরেছে; সে ষাঁড়ের মতো প্রাণপণে কেবলই চ্যাচাচ্ছে আর অন্য চোরেরা প্রাণভয়ে একেবারে চোঁ-চাঁ দৌড়!

এই হুলস্থুলের মধ্যে ছুটে এলো বিনির দাদা, ছুটে এলো বিনি লণ্ঠন নিয়ে······আর সেইসঙ্গে চাকর, ঠাকুর আর দারোয়ানের দল।

বিনি তাড়াতাড়ি গিয়ে পিশিমার মুখ থেকে কাপড়ের পুঁটলি খুলে নিতে দম্ ছেড়ে তিনি বাঁচেন। আর-একটু হলেই তাঁর অন্তরাত্মা খাঁচা-ছাড়া হয়েছিল আর-কি।

বিনি দারোয়ানটাকে ডেকে খুব বকলে, আর বললে, এইরকম

ক'রে তুমি পাহারা দাও? এদিকে চোর-ডাকাতে মানুষ মেরে ফেলছে আর তোমার নাকের ডাক থামেনা!

দারোয়ান ছুটে এসে মাটিতে লুটিয়ে প'ড়ে বললে, কসুর হুয়া মাইজী, আউর কভি এস্যা হোগা নেই!

ঝি ভয়ে-ভয়ে আগে-থেকেই সাফাই গেয়ে রাখলে, বাতের ব্যথায় মরে যাচ্ছি মা। আমি আগেই টের পেয়েছিনু গো... বাতের এমন কন্‌কনানি যে, বিছানা ছেড়ে উঠতেই নারনু।

বিনি ধমক দিয়ে বললে...উঠতে নারনু। বেশ ত', গতরটা নিয়েই নাহয় উঠতে পারলেনা, কিন্তু তোমার মুখে ত' আর কেউ কাপড় গুঁজে দেয়নি। চ্যাঁচামেচি করতেও কি দোষ ছিল?

ঝি বুঝলে কথাটা বেফাঁস ব'লে ফেলেছি। ওদিকে দিদিমণির দাদা আবার ফিক্‌ফিক্ ক'রে হাসছে! লজ্জায় জিব কেটে আবার সেই লজ্জাকে ঢাকবার জন্যে সে একহাত ঘোমটা দিয়ে ফেললে।

এতক্ষণে পিশিমার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তিনি হুঙ্কার দিয়ে বললেন, হ্যাঁ-হ্যাঁ, সবাইকার জারিজুরি এবার বোঝা গেছে। কেন, এই খোকাই ত' আমার পাশে ঘরে ছিল। এত কী ঘুম বাপু যে, আমার প্রাণ বেরিয়ে যায় আর তোমাদের হুঁস হয়না। ভালো তোদের সঙ্গে এসেছিলুম বাপু বেঘোরে প্রাণ খোয়াতে। আমি অপঘাতে মরলে তোদেরই বদনাম হ'ত। ব'লে তিনি সহসা এমন একটা
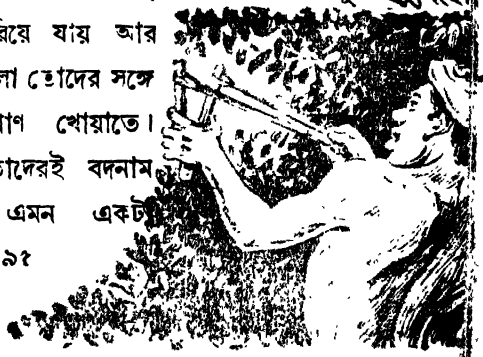
দুর্দ্দান্তের

কাণ্ড ক'রে বসলেন যে, বিনি পর্য্যন্ত অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

তিনি তাঁর আজন্মের সংস্কার আর ছুঁৎমার্গ পরিত্যাগ ক'রে সেই 'নোংরা কুকুরটাকে' কোলে তুলে নিয়ে বললেন, ও-ই আজ আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে···ঠিক সময়টিতে এসে বাঘের মতো লাফিয়ে পড়েছিল। আমি ওর গলায় সোনার শেকল পরিয়ে দেবো।

এইবার দুর্দ্দান্তের সত্যিই হাসি পেলে। মানুষগুলো সত্যি কী? উপকার পেলেই এরা গলায় সোনার শেকল পরিয়ে দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

এত বিপদের মধ্যেও বিনি হেসে ফেললে, বললে, পিশিমা, আনন্দে ডগমগ হয়ে তুমি যে আমার নোংরা কুকুরটাকে কোলে নিয়ে বসলে—এক্ষুনি ত' আবার গঙ্গায় ছুটতে হবে নাইবার জন্যে।

ধমক দিয়ে পিশিমা জবাব দিলেন, থাম্, থাম্, তোর আর অত গিন্নিপনা করতে হবেনা। সঙ্গে-সঙ্গে লজ্জিত হয়ে পড়লেন এই ভেবে যে, এই কুকুরটাকে সঙ্গে আনতে তিনি কত আপত্তি তুলেছিলেন। অথচ সেই নোংরা কেলে কুকুরটাই আজ তাকে যমের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। তিনি আপনমনে দুর্দ্দান্তের গলায় আর পিঠে হাত বোলাতে লাগলেন।

যে-লোকটার ঘাড়ে দুর্দ্দান্ত মরণ-কামড় দিয়েছিল, তার আর

ওঠবার শক্তি ছিলনা আদপেই। এইবার দারোয়ান আর চাকরের বীরত্ব সুরু হ'ল তাকে নিয়ে। দারোয়ান বললে ডাকুকো বাঁধ্‌কে হামারা ঘর-পর রাখ্‌দেগা—কাল ফজির-মে দেখা যাগা—

চাকরটা হাত নেড়ে বললে, ভারী তোমার বুদ্ধি। ওকে আটকে রাখলে, চোরেরা দলবল জুটিয়ে ওকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে। তার চাইতে ছুট যাও থানায়···দুটো কনেষ্টবলকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসো, তাদের হাতে সঁপে দিয়ে আমরা নিশ্চিন্দি হই।

বিনিও মাথা দুলিয়ে বললে, হ্যাঁ, সেই কথাই ভালো।

দারোয়ানজী পাগড়ী বেঁধে, লাঠি হাতে নিয়ে, সেলাম ঠুকে থানার উদ্দেশ্যে রওনা হ'ল। ঘায়েল চোরটা রইলো চাকরের জিম্মায়।

বাকি রাতটা কি কেউ ঘুমোতে চায়? বেতোরোগী ঝিয়ের আপত্তি সব-চাইতে বেশী। বিনি ধমক দিয়ে বললে, কে সারারাত ঠায় ব'সে থাকবে, শুনি?···

পিশিমা, চলো তুমি আমার ঘরে শোবে। ঝি, তুই তোর ঘরে চ'লে যা। দাদা আর টার্জ্জন তাদের ঘরে থাকবে।

রায় দিয়ে বিনি পিশিমাকে নিয়ে চ'লে গেল।

যাবার সময় শুধু ফোঁড়ন কাটলে, কাল সকালে উঠে টার্জ্জনের সোনার শেকলের কথা যেন ভুলে যেওনা পিশিমা।
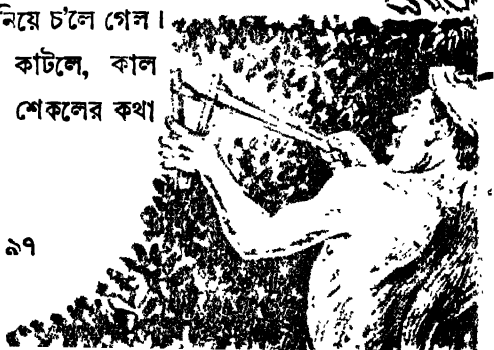
দুর্দান্তের

ঘর আবার অন্ধকার হয়েছে।

ওদিককার খাটে বিনির দাদা দিব্যি ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু ঘুম নেই দুর্দ্দান্তের দুষ্টু চোখে। এখানে ত' সে আর নীড় বাঁধতে আসেনি। আজ এই শেষ-রাতের আলো-আঁধারীর মধ্যেই তাকে বিদায় নিতে হবে। কাল সকালে আসবে গৃহস্বামী। বিনির মুখে জানা গেছে, সে নাকি আবার মিলিটারীর লোক। মিলিটারী লোকের যদি মিলিটারী-মেজাজ হয় তবে দুর্দ্দান্ত কিছুতেই সইতে পারবেনা তাকে—বিনি তার সঙ্গে যতই ভালো ব্যবহার করুক। কাজেই, মনের অমিল হওয়ার চাইতে মানে-মানে স'রে পড়াই ভালো।

বিনি মেয়েটি কিন্তু বেশ! ও যদি শ্রীমন্তের বড় দিদি হ'ত ত' বেশ হ'ত। কিন্তু যা হবার নয় তা ভেবে আর লাভ কি?

দুর্দ্দান্ত ভালোরকম জানে, আজ এই শেষরাত্রে সে চ'লে গেলে বিনি সকালে উঠে খুবই কান্না-কাটি করবে। নতুন ক'রে পেয়ে আবার হারাবার যে দুঃখু তা সে ভালো করেই জানে। কিন্তু সে ত' আর 'টার্জ্জন' নয়। এখানে থাকলে কিন্তু টার্জ্জনের ভূমিকায় অভিনয় সে ভালোই করতে পারতো।

সামনের দরজায় খিল দেওয়া ছিল। সে জানলা গ'লে বেরিয়ে গেল।...

এই ত' পালাবার উপযুক্ত সময়।

দারোয়ানজী গেছে পাহারাওয়ালার খোঁজে, চাকর-ব্যাটা ওদিকে চোরটার হেপাজত করছে, বেতো-ঝির নাকের ডাক একটু চেষ্টা করলেই শোনা যাবে। আর, বিনি? তার চোখেও কি এতক্ষণে ঘুম মায়াজাল বিস্তার করেনি? তার নতুন বিয়ে হয়েছে···মনে নতুন ক'রে খেলাঘর সাজাবার নেশা। 'টার্জ্জন'কে একবার সে হারিয়েছিল···এইবার নাহয় আর-একবার জনারণ্যে সে হারিয়ে গেল। দুদিন সে এসে তার বাড়ীতে টার্জ্জনের ভূমিকায় অভিনয় ক'রে গেল···বিনি যেন তাকে ক্ষমা করে।

— ১৭ —

পথকে আবার সে বরণ ক'রে নিলে। এখন আর সে টার্জ্জন নয়, সে এখন—দুর্দ্দান্ত! ঝড়ের গতিতে দস্যি দুর্দ্দান্ত যেন উড়ে চললো। সে এইটুকু বুঝতে পেরেছিল যে, যে-অঞ্চলে সে এসে পড়েছিল সেখান থেকে শ্রীমন্তের বাড়ী খুব বেশী দূরে নয়।

একটা দিন ক্রমাগত ছুটতে পারলে সে বোধহয় হাজির হ'তে পারবে।

আচ্ছা, শ্রীমন্ত কি এখনো তাকে মনে রেখেছে? আজও কি ইস্কুলে যাবার মুখে বই-পত্তর মুখে ক'রে নেবার জন্যে সে ভুল করেও একবার দুর্দ্দান্তের খোঁজ করে?

ঢং ঢং ক'রে যখন ইস্কুলের ঘড়িতে চারটে বাজে··· অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে শ্রীমন্ত আর হসন্ত ছুটে বাইরে আসে। সেই সময় সেই বটগাছের ছায়ায় তার নির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে কি ওদের চোখ একবারও গিয়ে পড়েনা? সে যেখানটায় গিয়ে দুবেলা বসতো সেখানকার খানিকটা জমির ঘাস শুকিয়ে লাল হয়ে গিয়েছিল। সেখানে আজ আর তার পায়ের চিহ্ন পড়েনা! হয়তো বাদলের ধারায় সেখানে নতুন তৃণ-দল মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়েছে। সেইসঙ্গে সে ওদের মন থেকেও কি একেবারে মুছে গেছে?

দস্যিপণ্ড

দুর্দ্দান্ত প্রখর সূর্য্যালোকের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে চললো।

ওর পায়ে কি আজ কেউ বিদ্যুৎ বেঁধে দিয়েছে? নইলে তার চলার গতি আজ এত দ্রুত হ'ল কি ক'রে?

এই সময়টায় একটা খামারের পাশ দিয়ে দুর্দ্দান্ত যাচ্ছিলো।

খামারের যিনি মালিক—তিনি বহু হাঁস-মুরগি এইখানে পালেন আর তাদের ডিম বিক্রি ক'রে বহু টাকা লাভ করেছেন এই যুদ্ধের বাজারে। কিছুদিন থেকে দেখা যাচ্ছে···প্রায় প্রতি রাত্রেই হাঁস আর মুরগি চুরি যাচ্ছে। মালিক তাই কড়া হুকুম দিয়েছেন পাহারাদারদের যে, আর যদি হাঁস-মুরগি খোয়া যায় তবে সঙ্গে-সঙ্গে তাদেরও চাকরি খতম হয়ে যাবে।

বেচারীরা ভেবেই পাচ্ছেনা—কি ক'রে এত পাহারার ভেতর দিয়ে রোজ হাঁস-মুরগি চুরি যাচ্ছে—

একজন বললে, নিশ্চয়ই শেয়ালে খেয়ে যায়। আজ জাল পেতে বেটাকে গ্রেপ্তার করতে হবে।

অপর জন জবাব দিলে, না রে! শেয়ালগুলো বড় চালাক। আর, শেয়ালই হোক, কুকুরই হোক, দূর থেকে তাদের ঘায়েল করতে হবে। আমি আজ গুল্‌তির ব্যবস্থা করেছি। সবাই এক-একটা গুল্‌তি নিয়ে সারা দিন-রাত পাহারা দেবো—দেখি, চোর বেটা কখন আসে—

এই মতলব ক'রে ওরা তিন-চারজনে আজ ব'সে আছে উপযুক্ত শিকারের আশায়।

দুর্দ্দান্তের
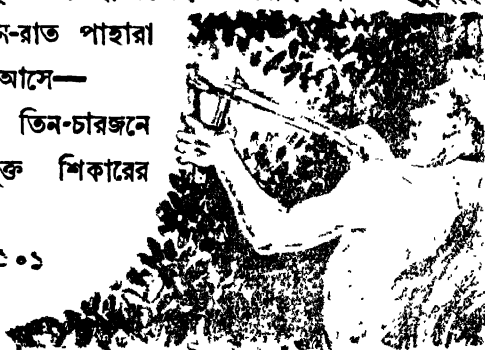
ঠিক এইসময় দুর্দ্দান্ত ছুটে চলেছে শ্রীমন্তের সন্ধানে। হঠাৎ একটা লোকের দৃষ্টি পড়লো ধান-ক্ষেতের ভেতর দুর্দ্দান্তের ওপর।

লোকটি লাফিয়ে উঠে বললে, দেখছিস তোরা? ওই হ'চ্ছে আসল চোর। হাঁস আর মুরগি খেয়েই বেটা এইরকম চেহারা করেছে। আমাদের এ-দেশী কুকুর ত' এ নয়!

ইতিমধ্যে আর-সবাইও গুল্‌তি নিয়ে তৈরী হয়ে পড়েছে। একজন বললে, নিশ্চয়ই কোনো মিলিটারী-সাহেবের কুকুর। আমাদের কত হাঁস-মুরগি খেয়ে একেবারে সাফ্‌ ক'রে ফেললে।

অপর ব্যক্তি ফোঁড়ন দিয়ে বললে, ওই বেটার জন্যেই ত' আমাদের সবাইকার নাক-কান কাটা গেছে মালিকের কাছে।

প্রথম ব্যক্তি জোর দিয়ে বললে, শুধু নাক-কান কাটা? আজ চাকরিই চ'লে যাবে। ভাই সব···সবাই একসঙ্গে মারো গুল্‌তি—

সোঁ-সোঁ শব্দে একসঙ্গে ছুটে চললো সকলের গুল্‌তি।

পথিকের মধুর-স্বপ্ন মুহূর্ত্তে গেল টুটে।

দুর্দ্দান্তের নাক, কান আর চোখের কোণ দিয়ে ক্রমাগত রক্ত ঝরতে সুরু ক'রে দিলে।

আরো—আরো গুল্‌তি ঝাঁকে-ঝাঁকে ছুটে আসছে ঠিক গুলিরই মতো।···লোকগুলোর অব্যর্থ হাতের তাক্‌!

দুর্দ্দান্ত এবার মরিয়া হয়ে ছুটে চললো। এ পথ ত' তার চেনা!

দস্যিপণা

কতবার ইস্কুলের ছুটির পর এই পথ ধ'রে শ্রীমন্তের সঙ্গে সে বেড়াতে এসেছে।

ওই ত' ঘোষেদের গোলাঘর, নন্দীদের আমবাগান আর তার পাশ দিয়েই বয়ে গেছে ছোট্ট শ্রীরেখা নদীটি! কতদিন পরিশ্রান্ত হয়ে ওই ঢালু-পারে নেমে তারা দুটিতে ওর ঠাণ্ডা জল পান ক'রে স্নিগ্ধ হয়েছে। আর কত দূর? পা যে আর চলছেনা। নাক দিয়ে আরো এক-ঝলক রক্ত উঠলো।

কিন্তু নেতিয়ে পড়লে ত' তার চলবেনা···ওই ত' সেই ঝাউ গাছের সার যার ভেতর দিয়ে ওরা প্রতিদিন সকালে ছুটোছুটি করতো!···ওই ত' সেই সাদা-বাড়ীটা···যেখানে এক বুড়ো একা থাকে···লোকে বলে, ভূতের বাড়ী!

কিন্তু এ কি! পাগুলো অবশ হয়ে আসছে কেন? চারটে কিন্তু এক্ষুনি বাজবে···শ্রীমন্ত এক্ষুনি বেরিয়ে আসবে ইস্কুল-ঘর থেকে···তার আগে তাকে পৌঁছুতেই হবে।

মরণ-পণ ক'রে দুর্দ্দান্ত আবার ছুটলো।

এই কি তার শেষ তীর্থ-যাত্রা? নইলে এমন ক'রে রক্ত বেরোয় কোত্থেকে?······তার মনের ভালোবাসার মতোই রাঙা?···

কুকুরের দেহে যে এত লাল রক্ত থাকতে পারে মানুষেরা বোধকরি সেকথা বিশ্বাস করতে চাইবেনা। সারা রাস্তায় যে হোলিখেলা সুরু হয়ে গেল।
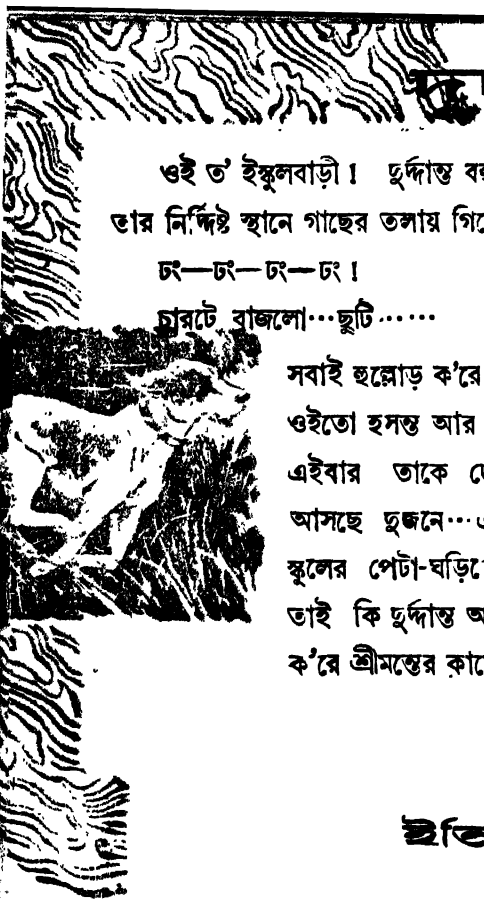
ওই ত' ইস্কুলবাড়ী। দুর্দ্দান্ত বহু কষ্টে দেহটাকে টেনে নি
তার নির্দ্দিষ্ট স্থানে গাছের তলায় গিয়ে পৌঁছুলো।

ঢং—ঢং—ঢং—ঢং!

চারটে বাজলো···ছুটি······

সবাই হুল্লোড় ক'রে বেরিয়ে আসছে···

ওইতো হসন্ত আর তার হাত ধ'রে শ্রীমন্ত!···

এইবার তাকে দেখতে পেয়েছে ওরা······ছু
আসছে দুজনে···এখন মরণেও সুখ।

স্কুলের পেটা-ঘড়িতে ছুটির ঘণ্টা বেজে চলেছে·
তাই কি দুর্দ্দান্ত আজ তার সমস্ত দস্যিপনা শে
ক'রে শ্রীমন্তের কাছে ছুটি নিতে এসেছিল?

ইতি